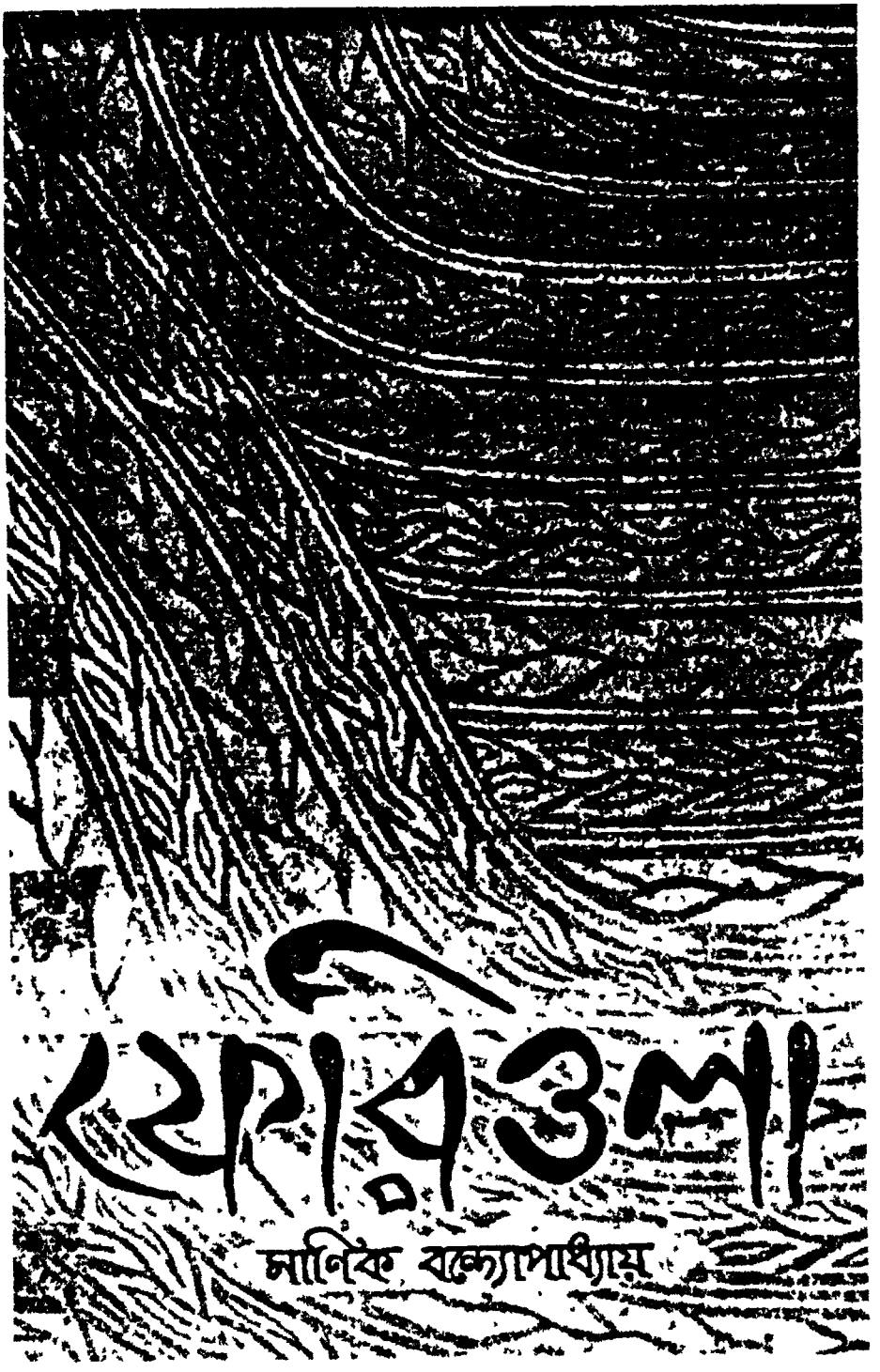

ফেরিওলা প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

গত দু-তিনবছর ধরে গল্পগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা কিন্তু গল্পগুলির মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের মূলসূত্রের একটা যোগাযোগ আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি সেইভাবেই গল্পগুলি বাছাই করেছি। অবশ্য এ বিচার পাঠক-পাঠিকা এবং সমালোচকের। আমি কেবল এই সংকলনটির জন্য গল্প বাছাই করার নীতির কথাটা উল্লেখ করলাম।

লেখক

বৈশাখ, ১৩৬০

ফেরিওলা

বর্ষাকালটা ফেরিওলাদের অভিশাপ।

পুলিশ জ্বালায় বারোমাস। দুমাসে বর্ষা হয়রানির একশেষ করে। পথে ঘুরে ঘুরে যাদের জীবিকা কুড়িয়ে বেড়ানো তাদের প্রায় পথে বসিয়ে দেয়।

না ঘুরলে পয়সা নেই ফেরিওলার। তার মানেই কোনোমতে পেট চালানোরও বরাদ্দ নেই।

আকাশ পরিষ্কার দেখেই জীবন বেরিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক ঘুরতে না ঘুরতে বৃষ্টি নেমে এসেছে।

পুরানো জীর্ণ বাড়িটার ঢাকা বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে মনে মনে সে বর্ষাকে অভিশাপ দেয়।

কিন্তু দেহটা যেন সায় দিতে রাজি হয় না। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগটাকে সাগ্রহে বরণ করতে চায়। দিন দিন যেন আরও বেশি বেশি দুর্বল মনে হচ্ছে শরীরটা।

বর্ষা বাদ সেধেছে রোজগারে, খাওয়া আরও কমে গেছে আপনা থেকে, সেই জন্য কী ?

এক কাঁধের শাড়ি চাদর আর অন্য কাঁধের গামছাগুলির ওজন খুব বেশি নয়। ভারী হওয়ার মতো বেশি মাল সে কোথায় পাবে ? এই সেদিন পর্যন্ত শুধু গামছাই ফেরি করত, কয়েক মাস যাবত কিছু শাড়ি আর বিছানার চাদর নিয়ে বেরোয়।

তবু এইটুকু ওজন কাঁধে নিয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুরেই যেন গায়ের জোর ফুরিয়ে আসে, হাঁটতে রীতিমতো কষ্ট হয়। শাড়ি চাদর গামছা চাই বলে হাঁক দিতে যেন দমে কুলোয় না, বুকে লাগে, কাশি আসে।

শাড়ি আছে ?

পাশের দরজার একটা পাট খুলে দাঁড়িয়েছে ছ-সাতবছরের হাফপ্যান্ট-পরা একটি মেয়ে। কিন্তু জিজ্ঞাসাটা তার নয়। দরজার আড়াল থেকে মেয়েলি গলায় প্রশ্নটা এসেছে।

শাড়ি আছে মা। নেবেন ?

কই দেখি।

একদিকে মিশকালো অপরদিকে টুকটুকে লালপাড়ওলা মিহি শাড়িটা জীবন ছোটো মেয়েটির হাতে তুলে দেয়। তার সাধারণ মোটা তাঁতের শাড়ির মধ্যে এখানাই সব চেয়ে সেরা এবং সব চেয়ে দামি কাপড়। আজ প্রায় দশ বারোদিন কাপড়টা নিয়ে ঘুরছে, বিক্রি হয়নি। দাম শুনে সবাই ফিরিয়ে দেয়। দরদস্তুর পর্যন্ত করে না।

এখানেও তাই ঘটে। দাম শোনার পর ফিরে আসে কাপড়টা।

কম দামের নেই ?

তিন-চারখানা রঙিন তাঁতের শাড়ি মেয়েটির হাতে ভিতরে যায় আসে, আসল দরদস্তুর শুরু হয় লালপাড়, ফিকে সবুজ জমির শাড়িখানা নিয়ে, জিনিসটার গুণকীর্তন করতে করতে জীবন দশ টাকা থেকে নামে, অপর পক্ষ চার টাকা থেকে অল্পে অল্পে ওঠে। রফা হয় ছ-টাকায়।

দর করতে পাকা হয়ে উঠেছে মেয়েরা। ফেরিওলাকে একেবারে অর্ধেকের চেয়ে কম দাম বলে বসতে পুরুষের সংকোচ হয়, মেয়েদের একবার ভাবতেও হয় না।

একটি টাকা আর সিকি দুয়ানিতে মিলিয়ে মেয়েটি দুটি টাকা তুলে দেয় জীবনের হাতে।

বাকিটা দুদিন পরে নিয়ো।

ধারে তো দিতে পারব না মা। সামান্য কারবার, দাম ফেলে রাখলে পোষায় না মা।

বাকিতে মাল দিতে হয় জীবনকে। দুপুরবেলা ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বেচাকেনা, মেয়েদের হাতে শুধু টাকা না থাকার জন্যই নয়, টাকা থাকলেও অনেক সময় কর্তাকে দিয়ে কেনাটা আগে মঞ্জুর করিয়ে নেবার জন্যও বাকিতে নেওয়া দরকার হয়। মঞ্জুর না হলে যাতে ফিরিয়ে দেওয়া চলে পরদিন।

অচেনা বাড়ি অচেনা মানুষ হলেও এটা মেনে নিতেই হয় ফেরিওলাকে। দুয়ারের কাছে বসে ঘরসংসার যেটুকু দেখা যায় দেখে আর সামনে এসে যে মানুষটা জিনিস পছন্দ করে কেনে তার বেশভূষা চালচলন থেকে ফেরিওলা আঁচ করে নিতে পারে ধারে মাল রেখে যাওয়া নিরাপদ কি না।

কিন্তু এভাবে ফেরিওলাব সামনে বেরোতে লজ্জা করাটা রহস্যজনক অস্বাভাবিক ব্যাপার। ফেরিওলাকে মেয়েরা লজ্জাও করে না, ভয়ও করে না।

এ অবস্থায় টাকা বাকি রাখা যায় না। কাল-পরশু এসে হয়তো শুনবে, কই, এ বাড়িতে কেউ তো কাপড় রাখেনি তোমার কাছে ! কাকে তুমি কাপড় দিয়েছিলে, কে রেখেছে তোমার কাপড় ?

ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় আবার মিনতি মেশানো উপরোধ আসে, দুদিন বাদে এলেই ঠিক পেয়ে যাবে।

বাকি দিতে পারব না মা।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটে। তারপর দরজার দুটি পাট খুলে এসে দাঁড়ায় শ্যামবর্ণা একটি বউ। লালপাড় ফিকে সবুজ জমির নতুন শাড়িটাই সে পরেছে।

করুণ কণ্ঠে বলে, মা বলে ডেকেছ, বাকি না রেখে গিয়ে পারবে না বাবা। গা থেকে খুলে নিতে হবে। তোমার সামনে আসতে পারিনি, তোমার কাপড়টি পরে তবে এলাম।

এ জুলুমের প্রতিকার নেই। আধঘণ্টা পরে বৃষ্টি ধরলে জীবন বিরস মুখে পথে নেমে যায়। শহরতলির শহরে আর গেঁয়ো পথে ধীরে ধীরে হাঁটে আর মাঝে মাঝে হাঁক দেয়। শহর আর গ্রাম শহরতলিতে একাকাব হয়ে যায়নি এখনও, পাশাপাশি ঘেষাঘেষি হয়ে এসেছে। এখানে ওখানে শুধু মিশে গেছে খানিকটা। শুধু একটা ইটের প্রাচীরের ব্যবধান হলেও পানাপুকুরটা খাপ খায়নি নতুন ঝকঝকে সিনেমা হলটার সঙ্গে।

কত রকমারি জিনিসের কত ফেরিওলা যে পথে নেমেছে এই শহরতলির। কিন্তু জীবন জানে তার হাঁক শুনলে ছিটকাপড় শায়া ব্লাউজওলার হাঁক শুনলে, সব চেয়ে বেশি উৎসুক মুখ উঁকি দেয় জানালা দিয়ে,' তারাই আকর্ষণ করে সব চেয়ে বেশি লুব্ধদৃষ্টি।

সন্ধ্যার আগে শ্রান্ত অবসন্ন দেহে জীবন শহরতলির সীমান্তে তার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। অ্যালুমিনিযামের বাসনের ঝাঁকা মাথায় একজন এগিয়ে আসছিল তারই মতো শ্রান্ত পায়ে ; দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করে, শাড়ির কেমন দাম ভাই ?

তেরো-চোদ্দো জোড়া হবে।

তেরো-চোদ্দো !

এগারো টাকাব নীচে নেই।

সে নীরবে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়।

বীণা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, কীরকম হল ?

সুবিধে নয়।

প্রায় ছেঁড়া ন্যাকড়া হয়ে গেছে বীণার কাপড়টা। ঘরে সে এটাই পরে। চৈতন্যবাবুর বাড়ি খাটতে যাওয়ার জন্য একমাত্র সম্বল একখানি আস্ত কাপড় সে সযত্নে তুলে রাখে। আপিসে যাওয়ার জন্য

ওদিকের ঘরের অঘোরের মতো একটি ধুতি, একটি পাঞ্জাবি আর একটি গেঞ্জির সেটটি প্রাণপণে বাঁচিয়ে চলার মতো। টেনেটুনে যতদিন চালানো যায়।

গামছা আর শাড়ি চাদরের বোঝা নামিয়ে জীবন চৌকিতে সটান শুয়ে পড়লে, বীণা ভূমিকা শুরু করে দেয়, শুনলে তো তুমি রাগ করবে, কিন্তু কী করব বলো উপায় ছিল না—অ্যালুমিনিয়ামের একটা হাঁড়ি কিনেছি ফেরিওলার কাছে।

একটু থেমে বলে, আগের হাঁড়িটা ফুটো হয়ে গেছে ক-দিন। তোমার রকম সকম দেখে আমি রাবু বলতে ভরসা পাইনি। ভাত তো রাঁধতে হবে, পিন্ডি? মাটির হাঁড়িটাতে চাল রাখতাম, ক-দিন সেটাতে ফুটিয়েছি। আজ সকালে সেটাও ফেঁসে গেছে।

জীবন কিছু বলে কিনা শোনার জন্য খানিকটা থেমে আবার বলে, একটু চালাকি করে বাকিতে রেখেছি। ওইটুকু হাঁড়ি, তার দাম সাত সিকে। দরদস্তুর করে পাঁচ সিকেয় রাজি করালাম। তা পাঁচ সিকে পয়সাই বা দিই কোত্থেকে? বললাম, ফুটোফাটা আছে কিনা দেখে কাল দাম দেব। কিছুতে বাকিতে দেবে না। কী করি? উনুনটা ধরেনি তখনও ভালো করে। হাঁড়িটা চটপট মেজে জল আর চাল দিয়ে ধোয়ার মধ্যেই চাপিয়ে দিলাম। ভেতরে ডেকে এনে দেখালাম। বললাম কী করি বলো, উনুনে চাপিয়ে দিয়েছি, ধারে না দিলে উনুন থেকে নামিয়ে নিয়ে যেতে হয়। গজর গজর করতে করতে চলে গেল।

নতুন হাঁড়িতে ভাত রান্না হয়েছে। ভাতে কি একটু নতুনত্ব লাগবে? বোঁটকা গন্ধটা একটু কেটে যাবে, ঠান্ডা হয়ে আসতে আসতে কড়কড়ে হয়ে যাবে না?

অবসাদ কল্পনাতেও কেমন ছেলেমানুষি রং লাগিয়ে দেয়। বাচ্চা দুটোর সঙ্গে বসে ট্যাড়স চচ্চড়ি আর ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে জীবন ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে মুষলধারে বৃষ্টি।

শেষরাত্রে নেমেছে। টুপটাপ জল পড়ে পড়ে ঘরের ভিতরটা অর্ধেক ভেসে গিয়েছে। ছাদটা একটু কাত হয়ে আছে একদিকে। কে জানে এভাবেই তৈরি হয়েছিল কিনা অথবা এটা প্রাচীনত্বের ফল। ধ্বসে পড়ুক আর যাই হোক, ভাগ্যে ছাদটা একটু কাত করা। পাশে জল চুঁইয়ে এলেও সরাসরি ঝরে না পড়ে ছাদ বেয়ে খানিকটা গড়িয়ে গিয়ে ঝরে– তাই চৌকিটা রক্ষা পায়।

রক্ষা পায় ছেঁড়া তোশক বালিশ জামাকাপড়ের সঙ্গে নতুন শাড়ি চাদর গামছা—আর বাচ্চা দুটো।

জীবন ভেবেছিল খুব ভোরে বেরিয়ে পড়বে মাল নিয়ে সরাসরি গিয়ে বউটির স্বামীকে পাকড়াও করে কাপড়ের বাকি দামটা আদায় করে ছাড়বে।

কিন্তু সবদিক দিয়ে শত্রুতাই যদি না করবে তবে আর বর্ষাকাল কীসের!

কে জানে সারাদিনে আজ এ বৃষ্টি ধরবে কি না?

বীণা গোমড়া মুখে বলে, এর মধ্যে কী করে কাজে যাই? কামাই করলে গিন্নি আবার খেপে যায়।

বীণার গায়ের রং শ্যাম, হাজায় হাজায় হাত আর পায়ের আঙুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় হাতে পায়ে বুঝি মরণ দশার পচন ধরেছে।

জীবন বলে, গিন্নি খেপে যান যাবেন, বর্ষা হলে মানুষ করবে কী?

চৌকিতে গুছিয়ে রাখা নতুন শাড়িগুলির দিকে চেয়ে বীণা বলে, তুমি তো বলে খালাস, গিন্নি এদিকে এবার পুজোয় কাপড় না দেবার ফিকিরে আছে। পরশু একবেলা কামাই করলাম, তাতেই শাসিয়ে দিয়েছে—কামাই করলে পুজোর কাপড় পাবে না বাছা, বলে রাখলাম।

না দেয় না দেবে। আমরা ভিখিরি নই।

ভিখিরি কীসের ? সব ঝি পায়। সারাবছর কাজ করলেই দুখানা কাপড় দিতে হবে।

জীবন মৃদু হেসে বলে, এ তো আগের নিয়ম গো, এবার ক-জনে পায় দেখো। নিয়ম বলে কিছু আছে দেশে ? নইলে লেখাপড়া শিখে গামছা ফিরি করি, তোমায় ঝি-গিরি করতে হয় ?

বীণা নিশ্বাস ফেলে বলে, জানো, মাগি টের পেয়েছে তুমি আমায় অন্য বাড়ি খাটতে দেবে না। নইলে এত তেজ দেখাতে সাহস পেত না। অন্য ঝি-রা কথায় কথায় কাজ ছাড়ছে, আজ এ বাড়ি কাল ও বাড়ি করছে।

মূক আবেদনের ভঙ্গিতে বীণা চেয়ে থাকে। কিন্তু জীবনের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ মেলে না। অন্য ঝিদের মতো এ বাড়ি ও বাড়ি কাজ করে বেড়াবার অনুমতি সে বীণাকে দিতে পারবে না। ঘরের কাছে হারাধনবাবুর বাড়ি, বুড়ো হারাধন ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ নেই। বউকে এখানে কাজ করতে দিতে হয়েছে তাই যথেষ্ট। তাকে পুরোপুরি ঝি বানিয়ে আর কাজ নেই।

অঘোরের আট বছরের ছেলে ভোলা এসে বলে, বাবা একটা বড়ো গামছা চাইল। মাসকাবারে দাম দেবে।

ধারে দিতে পারব না।

ভোলা ফিরে যায়। আবার এসে গামছার দামটা জিজ্ঞাসা করে যায়। তারপর কোমরে ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে অঘোর নিজেই আসে।

বলে, জানো হে জীবন, বন্ধুর দোকানে চিরকাল বাকিতে গামছা কিনেছি। আজ বিপাকে পড়ে তোমার কাছে নগদ দামে কিনতে হল। গামছা পর্যন্ত চুরি যায়, অ্যাঁ ? তাও এক মাসের ওপর ব্যবহার করেছি ?

চুরি গেছে ?

তবে কী ? কাজে যাবার একটি কাপড় সম্বল, গামছা পরে নাইতে যাই। কে মেরে দিয়েছে কে জানে ! আমার গামছা ব্যবহার করে তোরও যেন গেঁটে বাত হয় বাবা ! ভাবলাম দুত্তেরি, ন্যাংটো হয়েই নাইতে যাই ! তা কেমন লজ্জা করতে লাগল !

অঘোর ফোকলা মুখে হ্যা হ্যা করে হাসে।

আপনার লুঙ্গিটা কী হল ?

সেটাও চুরিই গেছে বলতে পার। ঘরের মানুষ চুরি করেছে এই যা তফাত। লুঙ্গিটা কী জান ভায়া, ইস্তিরির লজ্জা নিবারণ করছে। ভালো একটা শাড়ি তোলা ছিল, বড্ড পাতলা, সেইটে পরতে হল—তা, বলে কিনা লজ্জা করে। তোমার লুঙ্গিটা দাও, শাযার মতো পরব। এক মেয়ে পার করেছিস, আরেক মেয়ের বিয়ের বয়স হল, তোর অত লজ্জা কীসের ? ও সব পাট চুকিয়ে দিলেই হয় ! তা লজ্জাবতীরা মরলেও কী তা বুঝবে ?

অঘোর আবার শব্দ করে হাসে। জীবনের শাড়ি ক-টার দিকে চেয়ে থেকে বলে, বাকি দিলে একটা শাড়ি নিতাম। তা, বাকি তো তুমি দেবে না ভায়া !

জীবন খানিক চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে, আপিস থেকে ফিরে পরবেন কী ?

গিন্নি যদি লুঙ্গিটা ফেরত দেন, সেটা পরব। নইলে তোমার এই গামছা। ততক্ষণে শুকিয়ে যাবে।

অঘোর চলে গেলে বীণা শুধোয়, ঘরে বসে কত রোজগার হল ?

রোজগার কোথায় হল ? এক বাড়িতে থাকি, পড়তা দামেই দিতে হল।

অ কপাল ! আমি ভাবলাম ঘরে বসে বউনি হল, বিষ্টিটা আজ ধরলে হয়। আজ বেরোলে সব মাল বিকিয়ে যাবে।

জলেব ফোটা বাঁচিয়ে উনানটা পাতা হয়েছে। পুঁইশাক কুটতে বসে নিজেব গা-টা একেবাবে বাঁচাতে পাবেনি, টপটপ কবে বাঁ কাঁধে জল পড়েছে।

এ বেলা শুধু পুঁইশাকেব চচ্চড়ি। বাড়িতে ডাল নেই একদানা। হাত একেবাবে শূন্য নয় জীবনেব। ক-দিনেব মাল বেচাব টাকা বাকসে জমা আছে। টাকা আছে কিন্তু ডাল ও তবকাবি এমনভাবে একটু বেশি কেনাব উপায় নেই যাতে আবাশ ভেঙে বর্ষা নামলে একটা বেলা চলে যায়।

ওই টাকায় মাল কিনতে হবে।

টাকা আছে খবচ কবা যায় না। এ অবস্থায় এ যে কা অসহ্য সংযম মানুষেব, জীবন ছাড়া কে বুঝবে।

দুপুবে বৃষ্টি থামে। মেঘ সবে গিয়ে বেবিয়ে আসে নীল আকাশ। বোদ ওঠে কড়া।

জীবন বেবোবাব জন্য তৈবি হয়। বীণা বলে, ভাতেব হাঁড়িব দামটা বেখে যাও। আজ দাম না পেলে গাল দিয়ে যাবে।

হাঁড়িব দামটা তাব হাতে দেবাব সময় জীবন ভাবে, সে ও যদি বাকি টাকাব জন্য গাল দিতে পাবত ওই বউটিকে।

কাঁধে পসবা চাপিয়ে সে বেবিয়ে যাবে অঘোবকে জামা পবে ঘব থেকে বাব হতে দেখে জিজ্ঞাসা কবে, আপিস যাননি দাদা ?

যা বিষ্টি, কী কবে যাই বল ?

অঘোবেব তবে ভালো আপিস, বৃষ্টিব দোহাই মানে।

কোন দিকে যাবেন ?

আপিসেই যাচ্ছি।

ফেবিওলাকে পাড়া বদলাতে হয় বোজ। একদিন যে পাড়াটা চষে, ক দিন বাদ দিয়ে তবে আবাব সে পাড়ায় আসতে হয়।

সকাল থেকে বৃষ্টিব কৃপায় বিশ্রাম পেয়েছে, জীবন পা চালিয়ে দেয় দূবেব সব চেয়ে ঘনবদ্ধ পাড়াব দিকে। ওখান থেকে বাজাব খানিকটা কাছে হয়, কিন্তু সে জন্য কিছু আসে যায় না। মেয়েবা কাপড় গামছা কিনতে দোকানে যায় বটে আজকাল, এ এলাকাব মেয়েবা কমই যায়।

বসতি খুব ঘন, গাদাগাদি কবা মধ্যবিত্তেব অনেকগুলি অন্তঃপুব।

হাঁক শুনে এক দোতলা বাড়ি থেকে জীবনকে ডেকে চাব পাঁচটি মেয়েবউ কাপড় দেখছে, বাইবে আবেকজনেব হাঁক শোনা যায় ছিটকাপড় —শায়া ব্লাউজ চাই। তাকেও ডেকে আনে মেয়েবা। কাঁধে ছিটেব থান আব পিঠে শায়া ব্লাউজ ফ্রকেব পুঁটলি নিয়ে আপিসেব কেবানি অঘোবকে ফেবিওলাদেব দুপুববেলাব আসবে নামতে দেখে জীবন হাঁ কবে চেয়ে থাকে।

অঘোব হেসে বলে, অবাক হয়ে গেছ ভায়। বলবখন সব বলবখন।

দুজনেবই বিক্রি হয়। জীবনেব লাল কালো পাড়েব শাড়িটা কিনে নেয় মাঝবয়সি একটি বউ, ভালোই লাভ থাকে জীবনেব। অঘোব বেচে দুটি ব্লাউজ। তাব বকম সকম দেখে বেশ বোঝা যায়, আজকেই সে হঠাৎ ফিবি কবতে নামেনি। সে-ও পাকা ফেবিওলা।

একসাথে পথে নেমে অঘোব বলে, ক মাস চাকবি গেছে। চাকবি জোটে না, কী কবি, ভাবলাম তোমাব বাস্তাই ধবি। বসে খেলে চলবে কেন ?

তা গোপন কবেছেন কেন ? ফিবি কবেন বলতে লজ্জা হয় নাকি দাদা ?

লজ্জা না কচুপোড়া। যার পেট চলে না তার আবাব লজ্জা ! কী জান, মেয়েটার একটা সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে। শ্রাবণের শেষ তারিখে বিয়ে। আপিসে কাজ করি জেনে মেয়েটাকে পছন্দ করেছে, জামা ফিরি করি শুনলে যদি পিছিয়ে যায় ? এই ভয়ে ফাঁস করিনি কিছু। যাবার সময় বন্ধুর দোকানে মালপত্র রেখে যাব, ঘরে নিই না। তুমি যেন আবার পাঁচজনের কাছে ফাঁস করে দিয়ো না ভায়া।

জেনেও কী তা করতে পারি দাদা ?

ভদ্দরলোক সেজে থেকেই মেয়েটাকে পার কবি, তারপর দেখা যাবে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সামনে গিয়ে ছিটকাপড় শায়া ব্লাউজ হাকব।

দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় নেই। দুজনেই দুদিকে পা চালায়।

আরেকটা দিন শেষ হয়ে আসে। বর্ষাকালের আধখানা বৃষ্টিহীন দিন।

ঘরের দিকে পা বাড়ায় জীবন। শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে এলেও একটু ঘুরপথ ধরে খানিকটা বেশি হাঁটতে হলেও অবসন্ন শরীরে সেই বউটির বাড়িতে একবাব সে তাগিদ দিয়ে যাবে।

ওব স্বামী যদি কাজ থেকে ফিরে থাকে তবে তো কথাই নেই।

বারান্দার মাঝামাঝি বাড়ির প্রধান দরজাটা খোলাই ছিল। বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিল খালি গায়ে পাজামা পরা একটি যুবক।

পাশের দিকের বন্ধ দরজাটা দেখিয়ে জীবন বলে, এ ঘবের বাবু আছেন ?

সে উদাসভাবে বলে, আছে বোধ হয়। ডেকে দ্যাখো।

কড়া নাড়তে দরজা খুলে উঁকি দেয় সেই ছোটো মেয়েটি।

তোমার বাবা ঘরে আছেন খুকি ?

বাবা তো বেরোয়নি। বাবার জ্বর।

ভেতর থেকে পুরুষের গলা শোনা যায়, কে বে রাধি ?

সেই কাপড়ওলাটা।

গায়ে একটা জীর্ণ শতরঞ্জি জড়িয়ে ভেতরের মানুষটা জীবনের সামনে এসে দাঁড়ায়। অ্যালুমিনিয়ামের বাসনের সেই ফিরিওলাকে রক্তবর্ণ চোখ নিয়ে সামনে দাঁড়াতে দেখে নিজেব পাওনা টাকাটার বদলে প্রথমেই জীবনের মনে আসে এই কথা যে লোকটার খুব জ্বর, কয়েক দিনের মধ্যে বীণার কাছে হাঁড়ির দামটা সে চাইতে যেতে পারবে না।

সংঘাত

বিন্দের মা তার খড়ের ঘরের সামনের সরু বারান্দাটুকুর ঘেরা দিকে তাদের আশ্রয় দিয়েছিল।

ঘরে ঢুকবার দরজা বারান্দার মাঝামাঝি, তার এদিকের অংশটা ঘেরা, ওদিকটা ফাঁকা। চালাটা বারান্দার উপরে নেমে এসেছে, কোমর বাঁকিয়ে নিচু হয়ে বারান্দায় উঠতে হয়।

তিন হাত চওড়া ও হাত পাঁচেক লম্বা হবে ঘেরা অংশটুকু বারান্দার—তার ভাড়া দুটাকা। বাচ্চাটাকে ধরে তারা তিনটি মোটে প্রাণী, তাদের নড়তে চড়তে কষ্ট হয়।

বিন্দের মা তাদের আশ্রয় দিয়ে বলেছিল, এখন এমনি থাকো। কাজকর্ম জুটিয়ে নাও, তারপর দুটাকা ভাড়া দিয়ো। মাসে দুটাকার বেশি চাইব না আমি।

গাছতলা ছাড়া গতি ছিল না তখন তাদের। কত ভালো লেগেছিল বিন্দের মা-র কথাগুলি !

দুবাড়িতে বিন্দের মা শৈলর কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। কত ভালো মানুষ মনে হয়েছে তাকে !

মাসকাবারে বেতন পেয়ে আজ এই আঁধার ঘুপচিটুকুর জন্যে দুটো টাকা দিতে কিন্তু গাটা চড়চড় করে শৈলর। ছেলে কোলে দুবাড়িতে খেটে কত কষ্টে রোজগার করা কটা টাকা !

জীবনে নিজে খেটে প্রথম রোজগার।

মাখনের এখনও কাজ জোটেনি। এই সামান্য টাকা থেকে ঘরভাড়া দিলে তারা খাবে কী ?

শৈল বলে, মানুষটা একটা কাম জুটাইয়া নিক, তারপর থেইকা ভাড়া নিয়ো। কয়টা টাকা পাইছি, ভাড়া দিলে থাকব কী ?

বিন্দের মা গালে হাত দিয়ে বলে, কাজ না জুটিয়ে দিলে ও টাকাও পেতি ? দুটো টাকা ভাড়া দেবে তার বায়না কত !

চাষির মেয়ে শৈল ফোঁস করে ওঠে, বায়না কীসের ? ভাড়া দিমু না কইছি ! দাও, টাকা মিটাইয়া দাও।

মাইনে এনে মাখনের হাতে তুলে দিতে হয়েছে শৈলকে। সে স্বামী, তারও মালিক, তার রোজগারেরও মালিক। টাকা হাতে নিয়ে গুনে দেখে চোখ পাকিয়ে মাখন বলেছিল, টাকা লুকাইছস ? বড়ো দালানে বারো টাকা না ? বাইর কর তিন টাকা।

মরণ আমার ! কবে কামে লাগছি খেয়াল আছে ?

তা বটে। ও বাড়িতে পুরো মাসের মাইনে শৈলর পাবার কথা নয় !

মাখন দুটো একটাকার নোট ছুড়ে দেয় বিন্দের মা-র দিকে, নোট দুটো ফরফর করে উড়ে মাটিতে পড়ে।

কুড়িয়ে নিয়ে চোখ পাকিয়ে তাঁদের দিকে তাকায় বিন্দের মা। পেট ভরে খেতে জোটে না, দয়া করে থাকতে দিয়েছি, তেজ কত। তবু যদি মিনসের নিজের রোজগার হত, বউয়ের ঝি-গিরির টাকায় ঘরে বসে না খেত।

চাল ঝাড়ার বাড়তি কাজ করে শৈল কিছু খুদ এনেছে। মাখন বলে, খুদ থুইয়া দে। এক সের চাল আর কিছু মাছ নিয়া আসি। কতকাল মাছ খাই না।

আলাপাথারি খরচ কইরো না।

কাইল পরশু ওই ঘরের বেতন পাবি না ?

সারাডা মাস চালান লাগবো না ?

মাখন নির্বিচারে হেসে বলে, তুই ভাবছস কী ? আমি কাম করুম না ? খাইটা খামু, ডর কীসের !

শৈলের একখানা শাড়ি দুখণ্ড করে সে লুঙির মতো পরে। কাঁধে ময়লা দুর্গন্ধ গামছা। শৈলব মোটে একখানি কাপড় সম্বল, সারাদিন পরে, লোকের বাড়ি কাজ করে, রাঁধে বাড়ে—সবই করে। রাত্রে শোবার আগে গা ধুয়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া গায়ে জড়িয়ে কাপড়খানা কেচে মেলে দেয়।

মাটির একটা হাঁড়ি আর ছোটো একটি কড়াই ছাড়া বাসনপত্র কিছুই নেই। একটা উনান পর্যন্ত নেই। কাজ সেরে এসে বিন্দের মা-র রান্না শেষ হলে তার উনানে ভাত বা খুদ সিদ্ধ করে নিতে হয়। কিছু কয়লা ধার হয়েছে।

আর কিছু হোক বা না হোক চলনসই একটা ঘর, দুটো বাসন, নিজেদের একটা উনান – পেটের চিন্তাই সবার উপরে উঠে আ'ছে। পূজার সময় দুবাড়ি থেকে সে দুখানা শাড়ি পাবে—সে পর্যন্ত নয় এভাবেই চালিয়ে যাবে কোনোমতে। কিন্তু কী দুরন্ত কী ভয়ানক এই পেটের খিদে !

বিন্দের মা এত ক-টি ভাত খায় ভাজা ব্যঞ্জন দিয়ে আর হাঁ করে শহরে নবাগতদের দুটি কাঁচা লংকা দিয়ে এককাঁড়ি ভাত কোঁত কোঁত করে গিলে ফেলার কসরত চেয়ে দ্যাখে !

রেশনের চাল আনে—দুদিনে তিনবার চারবার করে খেয়ে শেষ করে দেয় ! আটা কোনখান দিয়ে কীভাবে শেষ হয়ে যায় টের পায় না। তারপর চলে এ বেলা আধপেটা, ও বেলা সিকি-পেটা সে বেলা উপোস—চাল ধার করার চেষ্টা এবং শৈলর বাড়তি কাজ করে আনা খুদটুকু দিয়ে কোনো রকমে দিন কাটানো।

বিন্দের মা অন্যদের কাছে বলে, ছি ছি রাম রাম। মাগো মা, এমন পেটুক, এমন বেহিসেবি ! আর কী নোংরা বাবা, মদ্দমাগি কেউ কী ঘাট করে কাপড় ছাড়বে ? ছাড়বে কী, থাকলে তো ছাড়বে। সম্বল তো ওই পরনের ন্যাকড়াটুকু।

হাড্ডিসার পেট মোটা পাঁচ বছরের বাচ্চাটা এখনও মাই খায়। ওকে ছাড়া একদণ্ডে জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে শৈলর, তবুও ওর জন্যই প্রাণ তার অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ওকে নিয়ে কাজে যেতে হয়, ঘর ধোয়া বাসন মাজা উনান নিকানো সব কাজ করতে করতে সর্বদা ওকে সমালাতে হয়। খাওয়া-দাওয়ার সময় দূরে দাঁড়িয়ে নজর দিলে, ঘরে গেলে, বাড়ির মানুষ বিরক্ত হয়, গজগজ করে।

কড়া সুরে বলে, ওকে রেখে আসতে পার না ? বড়ো নোংরা বাছা তোমার ছেলে। গায়ে প্যাঁচড়া, কানে ঘা,—ছেলেপিলের না ছোঁয়াচ লাগে।

মাখনের কাজ নেই কিন্তু বাচ্চাটাকে রাখতে সে রাজি নয়। বলে, তর পোলারে নিয়া থাকুম, কামের খোঁজে যামু না ?

বাড়ি ফিরে শৈল দ্যাখে সে চিত হয়ে কাঁথায় শুয়ে আছে। শোনে বাড়ির বাইরেও সে যায়নি একবারও।

ঝগড়া করলে মাখন মুখ খিচিয়ে বলে, হ, বুঝছি সব, তোর মতলব খারাপ। ক্যান পোলারে নিয়া কেউ কাম করে না ? সুবিধা হয় না বুঝি পিরিত করনের ?

পিরিতের একটা অশ্রাব্য বিশেষণের মুখে আগুন জ্বেলে দিয়ে বাচ্চাটাকে দড়াম করে ফেলে শৈল মুখ খোলে। বিন্দের মা কান পেতে শোনে। অনেক কটুকথা শৈল বলে কিন্তু মাখন যে বসে বসে তার রোজগাব খাচ্ছে এ কথাটা একবার একটু ইঙ্গিতেও উল্লেখ করে না !

মাখন বলে যে জানে ; সে সব জানে। বিন্দের মা-ই তাকে বলে দিয়েছে খোকাকে তার সঙ্গে দিয়ে কাজে পাঠাতে, একলা তাকে কাজে যেতে বারণ করেছে।

বিন্দের মা সামনে এসে বলে, ও কথা তোকে কখন বললাম রে মুখপোড়া ? ভালো চাইলে উনি মন্দ বোঝেন ! আমি বললাম মায়ের ছেলে মায়ের সাথে থাকবে, কাজে যাক বা সে চুলোয় যাক—মরদ মানষের কী ছেলে আগলে ঘরে বসে থাকলে চলে ? কাজ খুঁজতে মন নেই, মোর নামে উলটো গাইছেন !

মাখন চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকে।

বিন্দের মা খনখনিয়ে বলে, চোখ রাঙাচ্ছে। আরে আমার ব্যাটাছেলে ! বউয়ের রোজগার বসে খায়, লজ্জাও নেই।

শৈল যে খোঁচাটা কখনও দেয় না, মাখনকে সেই খোঁচা দিয়ে বিন্দের মা যেন স্বস্তি পায়।

মাখন ফিরে আসে—চাল নিয়ে, তরকারি নিয়ে, শিশিভরা তেল নিয়ে—দেড়পো গলদা চিংড়ি নিয়ে।

ক্ষণেকের জন্য লোভাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে শৈল চাঙা হয়ে ওঠে, তারপর বিমর্ষ বিরস মুখে মাই ছাড়িয়ে ছেলেটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

কয় টাকার সওদা করছ ?

তা দিয়া তর কাম কী ?

বিন্দের মা একবার উঁকি দিতে এসে গালে হাত দিয়ে ফিরে যায়। তার রান্না শেষ হলে তোলা উনানটি বারান্দায় এনে দুটি কয়লা দিয়ে গোমড়া মুখে শৈল নিজের রান্না শুরু করে—এতটুকু উৎসাহ আছে মনে হয় না।

আমি যদি আজ ভাত খাইছি, তরে কী কইলাম !

মাখন সজোরে নিজের উরুতে চাপড় মারে !

শৈল মাছ ভাজতে ভাজতে মুখ ফিরিয়ে একগাল হেসে বলে, না খাইলা, আমি একাই খাইয়া শেষ করুম—খোকা আর আমি। কতকাল পরে আইজ ইচা মাছ খামু !

সুতরাং রান্না হলে মাখন গোগ্রাসে এক থালা ভাত খায় ঝিঙা কুমড়ার তরকারি আর গলদা চিংড়ির ঝোল দিয়ে। মোড়ে বিন্দের মনোহারি মুদিখানা পান বিড়ি সিগারেট বেচার মিশ্রিত দোকান থেকে চোদ্দো আনা সের দরে কেনা দেড় সের চাল—চাল বেশ ভালো। শৈল অর্ধেক চালের ভাত রেঁধেছিল, তবু মাখন আর ছেলেকে খাইয়ে, তার পেট মনের মতো ভরল না।

শৈল এক রকম চাইতে না চাইতে দুবাড়িতে ঠিকে ঝির কাজ পেয়ে গেছে। বাচ্চাটা না থাকলে এবং ইচ্ছা করলে আরও এক বাড়িতে কাজ সে জোটাতে পারে অল্প চেষ্টাতেই। অনেক ঝি তিন বাড়িতে ঠিকে কাজ করে।

দেখা যায়, মাখনের কাজ জোটানো অত সহজ নয় !

কোন কাজ জুটিয়ে নেবে তাই তার ঠিক নেই।

চাষা মানুষ, চাষ করা ছাড়া কোনো কাজ জানে না।

চাষির মেয়ে চাষির বউ বলেই শৈল ঘরকন্নার কাজে পাকা—বাসন মাজা, মশলা বাটা, নিকানো, পোছান, উনান সাজানো, কয়লা ভাঙার মতো দৈনন্দিন সাধারণ সাংসারিক কাজে তো বটেই, ভদ্রঘরের অধিকাংশ মেয়েবউ যে কাজ একেবারেই জানে না অথচ আজ রেশনের ধুলো কাঁকড় মেশানো চাল আর গমকে কাজ না জানলে খাওয়াব যোগ্য করা যায় না—যেমন, কুলো দিয়ে ঝেড়ে নেওয়া—সে কাজেও !

শৈল দুবাড়িতে নিয়মিত বাসন মাজা-টাজার কাজ করে—চার-পাঁচবাড়ির গিন্নিরা তাকে ডাকিয়ে তার সুবিধা আর অবসর অনুসারে তাকে দিয়ে কুলো চালিয়ে কয়লার গুঁড়ো গোবর আর মাটি মেশান গুল তৈরি করিয়ে, চাল বা নগদ পয়সা মজুরি দেন।

কেউ কেউ বলে, কাজটা করে দিয়ে এ বেলা খাবি এখানে।

অর্থাৎ একবেলা খাওয়াটাই মজুরি।

বড়ো খিদে শৈলর। মাছ ডাল ভাজা তরকারি আশা করে সে মহোৎসাহে কাজ করে দেয়। বাবুরা ভালোমন্দ কত রকম খায় ঠিক ঠিকানা আছে কী।

খেতে বসে সে টের পায়, বাবুদেরও খাওয়া দাওয়ার বড়ো দুর্দশা।

যাই হোক, ভালো জিনিস না পাক, খানিকটা ডাল আর খানিকটা তরকারি দিয়ে সপুত্র পেট ভরানোর মতো ভাত তো সে পায়। খিদে কী অত বাছ বিচার পছন্দ অপছন্দ জানে, না মানে। নুন কাঁচালংকা দিয়ে পেট-ভরা ভাত পেলে সে বর্তে যায়।

ঝঞ্ঝাট বাধায় মাখন।

তেড়ে বলে, এত দেরি ক্যান? কোন কাম কইরা আইলি তুই যে এত দেরি হইল?

কিরা কথা কও? ঘরের মাইনষেরে খাওয়াইয়া তরে আমারে দিছে না?

দুপুরে বিন্দের মা শৈলকে ডাকে। বলে, আয় হাড়হাবাতে বোকা মেয়ে, চুল বেঁধে দি। খেটে মরবি বলে চুলটাও বাঁধবি নে? কী কুক্ষণে যে তোকে দেখে মোর মায়া বসেছিল রে –

কামে যামু না?

যাবি, যাবি। সাত তাড়াতাড়ি কাজে যেতে অত তড়বড়াস নে। দেরি টেরি করে যাবি মাঝে মধ্যে। আরে মাগি, মন দিয়ে টাইম মতো যত খাটবি তত পেয়ে বসবে যে, এটা বুঝিসনে। না খাটিয়ে কেউ তোকে একটা বাড়তি পয়সা দেয়? বাসিভাত নর্দমায় ফেলে দেবে, তবু তোকে দেবে না। দিয়েছে কেউ?

ক্যান দিব না? দয়ামায়া নাই মাইনষের? তিনতলা বাড়ির মালের তলার উনি

ফরসা মোটা সুন্দরী মাগিটা?

হ। উনি আমারে ডাইকা নিয়া আলাপ করেন, কোনো কাম করান না। গা হাত পা টিপা দেই, ঘামাচি মারি, উচা পেটটারে দইলা মইলা দেই—

বিন্দের মা মুচকে মুচকে হাসে।

বলে, না লো ছুড়ি ফরসা মোটা সুন্দরী বউটা তোকে মোটেই খাটায় না। আধঘণ্টা একঘণ্টা তোকে দিয়ে শুধু গা টেপায় পা টেপায় ঘামাচি মারিয়ে নেয়। একটু আদর চেয়ে নেয় তোর কাছে। তারপর আদর করে গলার হারটি খুলে তোর গলায় পরিয়ে দেয়। দেয় তো?

তা না দিক, শৈলর ছেলেকে দু-একটা লজেন্স চকোলেট তো দেয়। শৈলকে দু চারআনা পয়সা তো দেয়। ভরসা তো দেয় যে রাতদিন খাওয়া পরার চাকরি নিয়ে থাকতে চাইলেই শৈলকে সে রাখবে। কিন্তু উপায় কী, মাখনের জন্য তো সেটা হবার নয়।

মা গো মা! আর পারি নে তোর সাথে!—শৈলর জটবাঁধা রুক্ষ চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বিন্দের মা, মেয়ে বউ রোগে দুর্ভিক্ষে মারা যাওয়ার খবর পেয়ে উতলা হওয়ার মতো ব্যাকুলভাবে বলে, গাঁ থেকে তোরা এমন হাবাগোবা এসেছিস, মাইরি বিশ্বেস হয় না মেয়েলোক এমনই গোবু ছাগলের মতো বোকা হয়। তোর রোজগারে খাচ্ছে মানুষটা, উঠতে বসতে তোকেই লাথিগুতো মারছে, তবু তুই আটা-সেটার মতো লটকে রয়েছিস ওটার সাথে।

শৈল মাথা সরিয়ে নেয়। বলে, জট ছাড়াইয়া কাম নাই, বড়ো লাগে। চুল বাঁধুম অনে সুদিন আইলে।

আর এসেছে তোর সুদিন, যা বোকা তুই। সব হাতে তুলে দিস কেন, টাকা পয়সা কিছু লুকিয়ে রাখতে পারিস না?

কই লুকামু? টের পাইলে মাইরা ফেলাইব।

তুই করবি রোজগার, তোকেই মেরে ফেলবে ? থাকিস কেন অমন লোকের সঙ্গে ?

রাম রাম, অমন কথা কইয়ো না। তেমন মানুষ না আমি।

মাখন বেশ খানিকটা বেহিসাবি, বেপরোয়া এবং রগচটা মানুষ। সেই সঙ্গে স্বার্থপর। এ সমস্তই সহ্য হত শৈলর। যা হাতে পায় বেশি বেশি খেয়ে শেষ করে দিয়ে দুরবস্থার সীমা রাখে না বটে কিন্তু ভালোমন্দ জিনিসও সে একা খায় না, বেশি বেশি খাদ্য শুধু নিজের পেটেই চালান দেয় না। তাদের সঙ্গেই যে ভালো খায়, কষ্টও ভোগ করে সমানভাবে।

কিন্তু দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে তার সন্দেহ করা রোগটা। যুক্তি-তর্ক কিছুই সে বোঝে না। যদুর মা একবাড়িতে খাটে কাজে গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে, তবু তার কথা তুলে কুটিল বাঁকা চোখে চেয়ে প্রায়ই সে জানতে চায় কী এমন কাজ শৈল করে, তার কেন ফিরতে দেরি হয় ?

রেশন আনার পয়সা নেই। বিন্দের মা-র পরামর্শে মাখন নিজেই তাকে মাইনের দুটো টাকা আগাম চেয়ে আনতে বলে, শৈল টাকা এনে দিলে সেই বলে, চাওনমাত্র টাকা দেয়, বাবুর লগে খুব খাতির না ?

কাজ খোঁজার নামে বেরিয়ে গিয়ে আচমকা মাখন ফিরে আসে !

তাড়াতাড়ি ফিবা আইলা ?

আইলাম। ক্যান অসুবিধা হইছে নাকি তর ? কেউ আসব নাকি ?

একদিন একটু উৎসাহের সঙ্গে কাজের খোঁজে যায় তো তিন দিন ঘর ছেড়ে বেরোবার নাম করে না। শৈল জানতে পারে, সে কাজে গেলে মাখন বেবোয এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে, কাজ সেবে তাব ঘরে ফেবার সময় ফিরে আসে।

শৈল অনুযোগ দিলে, কাজের খোঁজে না গিয়ে ঘবে বসে থাকার জন্য ঝগড়া করলে, মাখন বেগে আগুন হয়ে ওঠে ! কেন, তাকে ঘর থেকে তাড়াবার এত আগ্রহ কেন ? কাজে গিয়ে কার সাথে কী বজ্জাতি কবে কে জানে, তাকে তাড়িয়ে ঘরেও বজ্জাতির সাধ ?

তুই আবও টাকা পাস। কোথায় লুকাইয়া রাখছস ক আমারে।

প্রচণ্ড ঝগড়া বেঁধে যায়। মাখন ধাক্কা দিয়ে শৈলকে ফেলে দেয়। শৈল বসে বসে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদে।

বিন্দেব মা কুটিল হিসেবি চোখে তাদের কলহ লক্ষ করে যায়।

বউ আব বাচ্চা দুজনের কান্না অসহ্য ঠেকায় বাচ্চাটার গালে একটা চড় বসিয়ে মাখন বেরিয়ে যায়। বিন্দের মা এসে কাছে বসে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে বলে, কী পাষণ্ড বজ্জাত মানুষ মাগো ! এমন করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, এইটুকু বাচ্চার গালে অত জোরে চড় বসালে ! তোকেও বলি বাছা, কেন এত সহ্য কবিস ? যত সইবি, তত বেড়ে যাবে। আমি হলে বাপু লাথি মেরে খেদিয়ে দিতাম। নিজে তুই রোজগার কবিস তোর ভাবনা কী ?

শৈল চোখ মুছতে মুছতে বলে, আমি যামু গিয়া।

বিন্দের মা খুশি হয়ে বলে, তাই যা। আমি তোকে ঘর ঠিক করে দেব।

শৈল কাজে যাবার আগেই মাখন ফিরে ' 'সে। কীভাবে কোথা থেকে বিড়ি জোগাড করে এনেছে সেই জানে, গোমড়া মুখে বসে জ্বলন্ত বিড়িটা টেনে শেষ করেই আরেকটা বিড়ি ধরায় !

শৈল কাজে গেলে বিন্দের মা মাখনের কাছে গভীর আপশোশ জানিয়ে বলে এ হল কলিকাল কী করবে বলো তুমি। ইদিকে তোমার কাজ নেই, উদিকে ছুঁড়ি পেয়েছে পয়সা-কামানোর সোয়াদ। শুধু বাসন মাজার পয়সায় কী মন উঠবে ওর ? তোমার সাধ্যি আছে ওকে ঠেকিয়ে রাখবে ! আজ বাদে কাল দেখবে কার সঙ্গে ভেগেছে।

খুন কইরা ফেলুম।

বিন্দের মা মুখ বেঁকিয়ে ভেংচি দিলে বলে, খুন কইরা ফেলুম ! আরে আমার মরদ রে ! অতই সস্তা যদি হত খুন করা, গন্ডা গন্ডা মাগি খুন হয়ে যেত। বোকাহাবা কোথাকার। এটা বুঝি তোর সেই পাড়াগাঁ পেয়েছিস যে খুশি হলে খুন করবি ? এ হল বাবা খাস কলকাতা শহর। কোথায় তলিয়ে যাবে মানুষের ভিড়ে এ জীবনে আর খোঁজ পাবি ভেবেছিস !

গুম খেয়ে রক্তবর্ণ চোখ মেলে মাখন বসে থাকে। নিজের অসহায় নিরুপায় অবস্থাটা সে মর্মে মর্মে অনুভব করছে টের পেতে বিন্দের মা-র বাকি থাকে না। সে গুজগাজ, ফিসফাস করে মাখনকে বোঝাতে থাকে সংসারের হালচাল, নিয়মনীতি !

তার মতে খুব সোজা নীতি। মাখনের মতো অবস্থায় যে পড়েছে তার কাছে অতি সুবোধ্য। পয়সা রোজগার করতে বেরিয়েছে যে মেয়েছেলে বাসন মাজা ছাড়াও অন্য উপায়ে বাড়তি রোজগার সে করবেই করবে। শ্রীভগবানেরও সাধ্য নেই তাকে ঠেকিয়ে রাখে। এভাবে চললে দুদিন বাদে শৈল তাকে ছেড়ে যাবেই, তার অন্যথা নেই। তার চেয়ে শৈলও হাতে থাকে, তার বাড়তি রোজগারও হয়, সেটা ভোগও করতে পারে মাখন, এ ব্যবস্থা কি ভালো নয় সব দিক দিয়ে ?

মাখন চুপচাপ শুনে যায়, কিছু বলে না। তার মুখ আর চোখের চাউনি দেখে বিন্দের মা-ই হঠাৎ একসময় থেমে যায়। কে জানে কীরকম মতিগতি এ সব গোঁয়ার রাগী মানুষের ! বাগ সামলাতে না পেরে হাতের কাছে পেয়ে তাকেই হয়তো মেরে বসবে !

শৈল রেহাই পাবার উপায় খোঁজে।

যেমন তেমন উপায় নয় সদুপায়। যাতে মাথা বিগড়ানো মানুষটার হাত থেকে সে রেহাই পাবে অথচ সন্দেহের জ্বালায় জ্বললেও মানুষটার মধ্যে সেটা আগুনেব মতো দাউদাউ করে জ্বলে উঠবাব কারণ ঘটবে না। কোনো ভদ্রপরিবারে খাওয়া-পরা দিনরাত্রির কাজ পেলেই সব চেয়ে ভালো হয়।

শৈল এ রকম কাজ খোঁজে। কিন্তু কোলে তার ছেলে, তাকে কেউ ওভাবে রাখতে চায না। তিনতলা বাড়ির ফরসা মোটা গিন্নি বলে, ছেলে না থাকলে আমিই তো তোকে রাখতাম। ছেলের ঝঞ্ঝাট কে পোয়াবে বাবা।

আমারে রাখেন। পোলারে দিদিমার কাছে থুইয়া আসুম।

বেশ, পয়লা থেকে কাজে লাগিস।

বাচ্চাটাকে ছেড়ে থাকতে মরে যাবে শৈল, কিন্তু উপায় কী। মাখনের মাথা খাবাপ হয়ে গেছে, এর সঙ্গে আর বাস করা যায় না। শৈলর মা প্রথমে এদিকেই ঝির কাজ আরম্ভ করেছিল, কলে কাজ পেয়ে উঠে গেছে। কলের কাজে উপায় বেশি। তার কাছে ছেলেকে রেখে এলে মাঝে মধ্যে শুধু গিয়ে দেখে আসা চলবে। কিন্তু উপায় কী ! মাসকাবারের আর মাত্র কটা দিন বাকি।

সেদিন ঠিকে কাজ সেরে ঘরে ফিরে দ্যাখে, তাদের কাঁথাকানি হাঁড়িকড়াই ও পাশের চালার ছোটো একটি ঘরে সবানো হয়ে গেছে। এই নিচু চালার খুদে খুদে ঘরগুলিও বিন্দের মা ভাড়া দেয়। এই ছোটো ঘরখানাই খালি ছিল।

বিন্দের মা একগাল হেসে বলে, তোর কপাল ফিরেছে লো। আমার ছেলে তোর মিনসেকে একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছে।

মাখন ঘরে ছিল না। সকালবেলা বিন্দের সঙ্গে কারখানার কাজে ভর্তি হতে গেছে।

শৈলর মুখে হাসি ফোটে না। কাজ পেয়েছে, নিজে খেটে রোজগার করবে কিন্তু মতিগতি কী বদলাবে মানুষটার, মেজাজ নরম হবে ? সারাদিন বাইরে থাকবে মাখন, সন্দেহের বিষে আরও সে জর্জরিত হবে। এ পোড়া শহরে এসে কপাল তার পুড়েছে চিরদিনের জন্য।

বিন্দের মা বলে, সুদিন এসেছে, আয় তেল দিয়ে চুল বেঁধে দি।

চুল বাঁইধা কাম নাই। ঘরের ভাড়া নিবা কত ?

যা দিবি তাই নেব। তোরা কি আমার পর ?

কী করে হঠাৎ তারা এত বেশি আপন হয়ে গেল বিন্দের মা র শৈল বুঝতে পারে না ? বুঝেই বা কী হবে? আর মোটে কটা দিন সে এখানে থাকবে।

বিকালে শ্রান্ত মাখন ফিরে আসে। লংকা দিয়ে জল দেওয়া ভাত খায়। কথাবার্তা বিশেষ বলে না। শৈলও চুপ করে থাকে।

খানিক পরে মাখন ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞাসা করে, মহারানি কিছু জিগান না যে ?

কী জিগামু ?

মাখন গুম খেয়ে থাকে।

বিন্দের মা মাখনকে আড়ালে ডেকে বলে, আমি তো বাপু পারলাম না। তুমি বলে দাও, চুলে একটু তেল দিক, সাবান-টাবান মেখে একটু সাফ-সুরুত হোক ?

বলব।

পরদিন খুব সকালে কাজে বেরোবার আগেই বিন্দের দোকান থেকে তেল আর সাবান এনে দিয়ে মাখন চোখ পাকিয়ে বলে, চুলে তেল দিবি, সাবান মাইখা চান করবি। ভূত সাইজা থাকলে ভালো হইব না কইলাম।

শৈল চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থাকে।

ব্যাপারটা কী কও তো শুনি ?

ব্যাপার আবার কী ? ব্যাপার কিছু না।

কাজে লেগেই অদ্ভুতভাবে বদলে গিয়েছে মাখন। মেজাজ বদলায়নি, বরং আরও রুক্ষ হয়েছে, কথায় কথায় চটে উঠে গাল দেয়, মারতে আসে। যতক্ষণ ঘরে থাকে গুম খেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে তীব্র বিদ্বেষের দৃষ্টিতে শৈলর দিকে তাকায়। কিন্তু সন্দেহ করে না, একেবারেই না। ছুটির দিন এক বাড়িতে গুল দিয়ে ফিরতে অনেক বেলা হল, মাখন একবার জিজ্ঞাসাও করল না তার দেরি কেন। এক অজানা আতঙ্কে শৈলর বুক কেঁপে ওঠে।

এ ঘরে উঠে আসার দিন চারেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর বিন্দের মা মাখনকে ডেকে বলে, এই কাপড়খানা পরিয়ে পাঠিয়ে দাও। দিনের বেলা দেখে গেছে, পছন্দ হয়েছে। এই নাও তোমার ভাগের টাকা।

মাখন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, আইজ যাইবো না, হাঙ্গামা করব। আর কিছু না থাক, মাগির তেজ আছে ষোলোআনা। আর কয়দিন যাক বুঝাইয়া রাজি করামু।

বিন্দের মা বলে, আ-মরণ ! এর আর বোঝানোর কী আছে ? গোলমাল করে দুঘা লাগিয়ে দিবি।

তুমি বুঝবা না। বড়ো তেজ মাগির।

মাসের শেষ তারিখ। পরদিন শৈল নতুন কাজে লাগবে। ভোরে উঠেই ছেলেকে মা-র কাছে রেখে আসতে যাবে। ফরসা মোটা গিন্নিকে বলা আছে প্রথম দিনটা কাজে লাগতে দেরি হবে। রাত্রে শৈল ভাবে, আজ মাখনকে জানাবে, না একেবারে সকালে জানিয়ে বিদায় নেবে।

এখন জানালে যদি হাঙ্গামা করে ?

মাখন জিজ্ঞাসা করে, এ পাশ ও পাশ করস যে ? ঘুম আসে না ?

না।

মাখন খানিক চুপ করে থাকে ! তারপর শৈলকে কাছে টেনে বলে, শোন, কাইল আমরা অন্য ঘরে উইঠা যামু।

ক্যান ? এখানে থাকুম না। বিন্দের মা বড়ো পাজি বজ্জাত মানুষ।

যতই তার পক্ষ টানুক আর তাকে সুখী করার জন্য ব্যস্ত হয়ে নানাপরামর্শ দিক, শৈলর কী আর জানতে বাকি ছিল যে বিন্দের মা পাজি বজ্জাত মানুষ। তার সঙ্গে হঠাৎ মাখনের খাতির জমতে দেখে আর তাকে তেল সাবান মাখিয়ে ভালো কাপড় পরাবার ঝোঁক চাপতে দেখে এটাও শৈল আঁচ করেছিল যে তাকে ফাঁসাবার একটা চক্রান্ত চলছে তলে তলে।

কিন্তু মাখনের দিকটা সে বুঝে উঠতে পারছিল না কোনোমতেই। বিন্দের মা-র খারাপ মতলব থাক, মাখন নিশ্চয় জেনে বুঝে তার মতলবে সায় দেয়নি, বিন্দের মা নিশ্চয় তাকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলেছে।

নইলে তাকে মিথ্যা সন্দেহ করেই যে মানুষটার এত জ্বালা সে কখনও জেনে শুনে বিন্দের মা-র বজ্জাতিতে সায় দিতে পারে ?

মাখনের কথা শুনে ভয়-ভাবনার একটা পাহাড় যেন নেমে যায়, হালকা হয়ে যায় শৈলর দেহমন। সে ভাবে মাখন তবে ধরে ফেলেছে বিন্দের মা-র আসল মতলব !

আর যখন ভাবে, ভাগ্যে শৈল টের পায়নি মরিয়া হয়ে বিন্দের মা-র পরামর্শে কী কাজ করতে যাচ্ছিল। ভাগ্যে বিগড়ানো মাথাটা তার ঠিক হতে আরম্ভ করেছিল একটা কাজ পেয়েই, দশজনের সঙ্গে খাটতে শুরু করেই !

শৈল বলে, কাল থেইকা আমি খাওয়া-পরার কামে লাগুম—রাতদিন থাকুম।

ক্যান ?

সন্দেহ করবা, মারবা—তোমার লগে থাকুম না।

মাখন খানিক ভেবেচিন্তে বলে, হ, ঠিক কইছস। আমার মাথাটা বিগড়াইয়া গেছিল। ক্যান এমন হইল কিছুই বুঝলাম না। আর সন্দেহ করুম না।

করবা না ?

না। তর গা ছুঁইয়া কইলাম।

সুতরাং শৈলর আর ফরসা মোটা গিন্নির বাড়ি কাজ নেওয়া হয় না। অন্যপাড়ায় একটা ঘর নিয়ে তারা দুবাড়িতে ঠিকে কাজ করে। সকালে রান্না হয় না, রাত্রে জল ঢালা ভাত খেয়ে মাখন কলে খাটতে যায়।

মাখনের বিগড়ানো মাথাটা কীসে সারল সে নিজেও বোঝে না, শৈলও বোঝে না। রাজি হয়ে গিয়েও মাখনের মাথাটা কেন বিগড়ে গেল এটা বোঝে না বিন্দে আর বিন্দের মা।

না বুঝলেও নেমকহারাম বজ্জাতটাকে কাজ জুটিয়ে দেওয়ার জন্য মায়-পোয়ে আপশোশ করে।

সতী

রাস্তার ধারে একটা লোক মরে পড়ে আছে।

আগের দিন পাড়ায় কেউ তাকে মরাব আযোজন করতে দ্যাখেনি। তীর্থগামিনী পিসিকে হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিয়ে প্রায় বাত এগারোটার সময় নরেশ বোধ হয় শেষ বাসেই রাস্তায় প্রায় ওখানটাতেই নেমেছিল।

সে নাকি পাড়ার চেনা ঘেয়ো কুকুরটাকে ঠিক ওইখানে ধাবায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখেছিল। তাকে বাস থেকে নামতে দেখে কুকুরটা অতিকষ্টে উঠে এসে দাঁড়িয়ে লেজ নেড়েছিল। নরেশের বড়ো ভয় হয়েছিল, কুকুরটা পাছে কামড়ে দেয়।

কাজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বাত এগারোটার আগে লোকটা ঘেয়ো কুকুরটার জায়গা বেদখল করে চিত হয়ে শুযে মরেনি। শেয়াল কুকুব ছাড়া রাত্রিবেলায় কেউ তাকে মরতেও দ্যাখেনি।

ভোরে উঠে দেখা গেল। রাত্রে কোথা থেকে এসে এইখানে শুয়ে মরেছে। কাউকে না জানিয়ে চুপিচুপি—একা। জগতে এতটুকু অশান্তি সৃষ্টি না করে।

কোমবে একফালি ন্যাকড়া জড়ানো। মরেও লজ্জা বজায় রেখেছে অথবা বলা যায়, লজ্জা বজায় রেখে মরেছে।

দেহটা অত্যধিক শীর্ণ শুকনো, যাকে বলে কঙ্কালসার। মাথায় একরাশি ধুলোয় মলিন রুক্ষ চুল, মুখে ইঞ্চিখানেক গোঁপ-দাড়ি গজিয়েছে। ভাব দেখে অনুমান করা যায় যে লোকটা এককালে চুলও ছাঁটত, দাড়ি গোঁপও কামাত, দু তিনমাস সেটা বাদ গেছে। গলায় সুতো দিয়ে ঝোলানো আস্ত সুপারির মতো কালো কাঠের সুন্দর বৈষ্ণবী খোলেব মাদুলিরূপী নিদানটি পাঁজরের উপর পড়ে আছে। বাঁ হাতের কনুইযে তিনটি মাদুলি, মানুষকে যা রোগ দুঃখ বিপদ-আপদ থেকে ত্রাণ করে। গবিবকে বড়োলোকও করে!

ভূতনাথ বলে, রোগে মরেছে, মনে হয় না। রোগে এমন চেহারা হলে আর উঠে আসতে হত না, যেখানে শুয়েছিল সেখানেই মরত।

অভয় বলে, রোগে না মরলেও বোগেই মরেছে। যা ভাবছ তা চলবে না। এ দেশে বাবা না খেয়ে কারও মরা বারণ। আমেরিকার গম আসছে, দু-চাবমন এসেও গেছে।

বিমল বলে, না খেয়ে কেউ মরেও না। যে-ই মরুক মরবার আগে হার্টফেল করে মরে। হার্টফেল করে মরা ছাড়া গতি নেই মানুষের, তে বা বলবে স্টার্ভেশন।

শচীন বলে, না বলাই উচিত। দেশের একটা মানসম্মান আছে তো? অন্য দেশে শুনলে ভাববে কী?

নরেশ ছেলেমানুষ, একটু ভাবপ্রবণ। কেউ মরেছে শুনলেই তার কষ্ট হয়, নিজের চোখে মরণ দেখলে তো কথাই নেই। সে বিরস বিষণ্ণ মুখে বলে, খুন-টুন হয়নি তো?

খুন হয়েছে বইকী। নইলে জোয়ান বয়সে মানুষটা মরে?

ছোরা-টোরা মেরে নয়, না? তাহলে রক্ত পড়ত। বিষ-টিষ খাইয়েছে?

আরে বোকা, বিষ হোক যাই হোক, কিছু খেতে পেলে কি মরত?

অল্পে অল্পে বেলা বাড়ে।

রেশন আনা বাজার করা ওষুধ কেনা ছাড়াও হাজারটা কাজে মানুষ এদিক ওদিক যায় আসে। রাস্তায় লোক চলাচল বাড়ে, বাস লরি মোটর গাড়ির হর্নের আওয়াজ অবিরাম হয়ে ওঠে, লোকে চোখ তুলে মৃতদেহটার দিকে তাকায়, কেউ একটু দাঁড়ায়, কাছাকাছি কয়েকজন যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রশ্ন করে। কেউ তাকাতে তাকাতেই চলে যায়।

সময় নেই, উপায় নেই, স্পৃহা নেই। একমুহূর্ত দাঁড়ালে হয়তো ফসকে যাবে আজও লাইনে দাঁড়িয়ে কয়েক ঘণ্টা ধন্না দিয়ে জরুরি দরকারি জিনিসটা পাওয়া, হয়তো লেট হয়ে যাবে কাজে। অর্ধপুষ্ট অপুষ্ট শরীরে আর টানা যায় না বাঁচাব লড়াই, খিদেয় ক্লান্তিতে ঘোলাটে মনের আকাশে দুর্ভাবনার মেঘে ঢেকে গেছে সব কৌতূহল আর শ্মশান-বৈরাগ্যেব ব্যথা বোধ, খেদের অবিরাম বিদ্যুৎ ঝলকানিতে জ্বলে গেছে চাক্ষুষ মরণকেও খাতির করার সাধ।

না, সত্যিকারের মরণকে নয়। সে মরণকে তুচ্ছ করার সাধ থাকলেও সাধ্য কই।

ওরা হল ব্যস্ত বিব্রত কাজের মানুষ, এই দুর্দিনে সংসারের জোয়ালে জুড়ে দেওয়া মানুষ।

কাজ নেই বলে বিব্রত বিপন্ন মানুষও কী কম ! ভিড় তাই জমে। মুখে আহা বলে খুব কম লোকেই ! হৃদয়গুলি উদাসীন হয়ে গেছে বলে নয়। এ রকম মরণ দেখে সহানুভূতি কি আর থাকে ? অসহানুভূতিই একটা গভীর বিরাগের রূপ নিয়ে ভেতরটা ঘুঁটে দেয়।

রেশনের দোকানে আজ অসম্ভব ভিড়। নতুন হপ্তা আজ শুরু হল। রেশন নিয়ে গেলে তবে অনেকের বাড়িতে আজ হাঁড়ি চড়বে।

নইলে পাঁচ সিকে সের চাল কেনা, নয়তো উপোস দেওয়া। মাসের এই শেষ হপ্তায় রেশন ছাড়া ক-জনেরই গত্যন্তর আছে ?

ঘড়ি আর ভিড়ের দিকে তাকালে ভরসা কমে আসে। মড়াটার জন্যই যথাস্থানে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে দেরি হয়ে গেছে দীননাথ আর অভয়ের। মানুষটা এসে মরেছে একেবারে বাড়ির সামনে।

ভাত খেয়ে আজ আপিস যাওয়া ঘটবে কী অভয় ?

দেখা যাক।

লাইন দিতে হয় না, দোকানের টেবিলে কার্ডগুলিই পরপর ঘাড়ে চেপে লাইন দেওয়াব প্রতীক হয়ে স্তূপ হয়েছে। বেশনকার্ডে অদৃশ্য নাড়ির সুতোয় এঁটে বাঁধা মানুষগুলি এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করতে পারে।

তবে, নিরুপায় হয়ে শুধু জটলা করাই সার। আশ্বিনের সকালের উজ্জ্বল মধুর আকাশ-বাতাস, প্রাণ কেন শারদোৎসবের ছোঁয়াচ আঁচ করতে পারে না কে জানে !

দেখা যায়, ছেলে কোলে একটি বউ এগিয়ে আসছে ক্লান্ত মন্থর পায়ে। খানিক এগিয়ে থেমে দাঁড়িয়ে কী যেন বলছে পথের ধারের দোকান অথবা বাড়ির মানুষকে। পরনের কাপড়খানা দেখে তফাত থেকে ভিখারিনি মনে হয় না।

রেশনের দোকানের সামনে এলে দেখা যায়, ছেঁড়া আর ময়লা হলেও পরনে তার তাঁতের রঙিন শাড়ি। বিবর্ণ বিশীর্ণ মুখে কোটরে-বসা চোখ, তেলের অভাবে একরাশি ঘন চুল জট বাঁধছে। শুকিয়ে আমসি বনে গেছে কোলের বছর দেড়েকের উলঙ্গ ছেলেটা, যেন নেশার ঘোরে ঢুলুঢুলু চোখে চেয়ে আছে বড়ো মানুষদের ভিড়টার দিকে।

পৃথিবীতে নবাগত শিশু। খিদে পেলেই চেঁচিয়ে চারিদিক মাত করা অধিকার সে যেন ত্যাগ করেছে—খিদেয় খিদেয় ঝিমিয়ে গিয়ে খিদের নেশায় ধুঁকবার অধিকার পেয়ে !

এদিকে একটা মানুষকে দেখেছ বাবুরা ? পাগলের মতো দেখতে ? কোমরে একটা কানি জড়িয়েছে, খুব চুলদাড়ি হয়েছে ? দেখেছ, মোর সোয়ামিকে ?

স্বামী আর সিঁদুর কিনা একাকার সবার চেতনায় তাই প্রথমেই স্বামীদের মনে হয় যে বউটার কপালে আর সিঁথিতে যা লেপা আছে তা আসল সিঁদুর নয়, দেখলেই বোঝা যায় যে জল দিয়ে শানে পোড়া ইট ঘষে সিঁদুর বানিয়েছে—এই সিঁদুর সিঁথিতে যতটা পারে গাদা করে চাপিয়েছে, কপালের ফোঁটাটা করেছে মস্ত। তাকালেই যেন লোকে বুঝতে পারে যে সে বউ—গেরস্ত ঘরের বউ।

ভূতনাথ ভাবে, হায় রে, শহরে বিজ্ঞানের এত চোখ ঝলসানো বিজ্ঞাপন, শহরে এসে তোকে ইটের গুঁড়ো দিয়ে নিজের গায়ে এই বিজ্ঞাপন আঁটতে হয় !

একজন বলে, কোন দিকে গেছে, স্বামীকে কোথায় খুঁজে বেড়াবে ?

এদিকে কাছে কোথা আছে। না খেয়ে ধুঁকছে মানুষটা, দূরে কোথা যাবে বাবু ? যাবার সাধ্যি পাবে কোথা ?

সে-ও ধুঁকতে ধুঁকতেই কথা বলে, প্রাণহীন স্তিমিত চোখে তাকায়।

তোমার ঘর কোথা ?

সে অনেক দূর গাঁয়ে। মানুষটারে দ্যাখোনি বাবু কেউ ?

ভূতনাথ বলে, এগিয়ে দ্যাখো তো, জলের কলটার কাছে, সাদা বাড়ির সামনে। ও রকম একজন শুয়ে আছে দেখলাম যেন।

শুয়ে আছে, না বাবু ?

শুয়ে আছে না বসে আছে কী করে বলব বলো ?

মরে যায়নি ? শুধু শুয়ে আছে ? না বাবু ?

নরেশের সর্বাঙ্গে কাঁটা দেয়।

কাঁদো কাঁদো মুখে সে বলে, তুমি আমার সাথে এসো। ও বোধ হয় অন্য লোক।

নরেশদের বাড়িটা পড়বে আগে—মড়ার কাছে পৌঁছবার আগে। পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকেই তাদের বাড়ি।

নরেশ ভাবে, আগে বাড়িতে নিয়ে একে কিছু খেতে দেবে কী ? বাচ্চাটাকে একটু দুধ সে খাওয়াবেই। সে জন্য বাড়ির লোকের সঙ্গে মারামারি করতে হলে মারামারি করবে।

কোনো প্রশ্ন করে না কেন বউটা ? তার স্বামীর মতো একজন রাস্তার ধারে শুয়ে আছে শুনেও ব্যাকুল হয় না কেন ? লোকটা যদি সত্যি এর স্বামী হয়, মরে গেছে দেখে কীভাবে হাহাকার করে কেঁদে উঠবে, কীভাবে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়বে নয় আছড়ে পড়বে—সেই মর্মান্তিক নাটকের কথা ভেবে তার নিজের বুকটা যে ধড়ফড় করছে !

কিন্তু দাঁড়িয়ে দেখতে হবে শুনতে হবে সব। পালিয়ে গেলে চলবে না। কাঁদাকাটার পালা চুকলে কী নাম কোথা থেকে এসেছে কীভাবে কী ঘটেছে সব বিবরণ জেনে নিতে হবে।

গলির মোড়ে পৌঁছে নরেশ বলে, বাচ্চাটাকে একটু দুধ খাইয়ে নেবে এসো।

আগে দেখে আসি। শুয়ে আছে, না ? ঘুমিয়ে আছে ?

ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে সে হাঁটে। তফাত থেকে দেহটার পড়ে থাকার রকম আর খানিক সরে দাঁড়িয়ে ভিড়ের মানুষগুলির জটলা করতে দেখেও সে একটু জোরে হাঁটে না।

মানুষের শুয়ে থাকা, ঘুমিয়ে থাকা আর মরে পড়ে থাকা যেন সমান হয়ে গেছে তার কাছে।

সিধুর দোকানের সামনে রোয়াকে একজন পুলিশ উবু হয়ে বসে আছে। মৃতদেহটা সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কাছে এসে দাঁড়ায় বউটি। একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। নিস্পৃহভাবে বলে, মরে গেছে, না ?

হ্যাঁ। তোমার স্বামী নয় ?

বউটি মাথা হেলিয়ে জানায় মড়াটা তারই স্বামী।

নরেশ থ বনে থাকে। এ কেমন বউ, অ্যাঁ ? রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ তো ? না, মৃত স্বামীর টানে— ? পা শিরশির করে নবেশের !

হঠাৎ চোখের সামনে শূন্যে মিলিয়ে না গিয়ে সকালবেলার তাজা রোদে দেহের ছায়া ফেলে তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নরেশ সবে একটু স্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছে, হঠাৎ যেন প্রাণ পায় বউটি। বাচ্চাটার দুপা ধরে শূন্যে তুলে প্রাণপণে রাস্তায় আছাড় মারে। মাথার খুলি চূর্ণ হয়ে যায়। তারপর নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ে চলন্ত বাসটার সামনে।

প্রমাণ হয়, কপালে আর সিঁথিতে অত করে ইটের গুড়োর সিঁদুর লাগালেও বউটি সেকালের স্ট্যান্ডার্ডের খাঁটি সতী নয়, তাহলে বাসের সামনে ঝাঁপ দিতে হত না, মৃত স্বামীকে দেখে আপনা হতেই প্রাণপাখি তার বেরিয়ে যেত। না খেয়ে না খেয়ে মরমর অবস্থাতে আপনা থেকে মরে যাওয়ার বদলে মরতে কিনা দরকার হল চলন্ত বাসের।

লেভেল ক্রসিং

দুর্ঘটনায় গাড়িটা জখম হয়। অল্পের জন্য বেঁচে যায় ভূপেন, তার মেয়ে ললনা এবং ড্রাইভার কেশব। খানিকক্ষণ কেউ কথা বলতে পারে না।

ললনা থরথর করে কাঁপে।

রুমালে চশমা মুছে, মুখ মুছে ভূপেন জিজ্ঞাসা করে, এটা কীবকম ব্যাপাব হল কেশব ? তুমি তো কাঁচা ড্রাইভার নও ?

কেশব বলে, সেই জন্যই বোধ হয় প্রাণে বেঁচে গেলাম আজ !

কেশবের নিজের তবে কোনো দোষ নেই ! তার অবহেলা বা বিচ্যুতির ফলে দুর্ঘটনা ঘটেনি ! নইলে গাড়িটা এভাবে জখম করিয়েও সে এমন ঝাঁঝের সঙ্গে কথা কইতে পারে ?

ললনা ঢোঁক গিলে বলে কী জন্য হল এ বকম ?

স্টিয়ারিং বিগড়ে গেল হঠাৎ।

তাই নাকি ? ও !

আস্তে গাড়ি চালাই বলে রাগ করেন। জোরে চালালে আজ তিনজনে না মরলেও জখম হতাম। আমার মন বলছিল হঠাৎ গাড়ি বিগড়ে যাবে। একটা পুরানো রদ্দি মাল...

ললনা ভূপেনকে বলে, খুব তো বিশ্বাস করেছিলে সলিলবাবুকে ? বন্ধুর ছেলে কী কখনও ঠকাতে পারে !

ভূপেন আপশোশ করে বলে, না, মানুষকে সত্যি বিশ্বাস নেই।

ভদ্রঘবের শিক্ষিত স্মার্ট ছেলে...

আপশোশ করে লাভ নেই। ভূপেন জবুরি কাজে বেরিয়েছে, যথাসময়ে যথাস্থানে তাকে গিয়ে পৌঁছতেই হবে। ললনা বেরিয়েছে সিনেমা দেখার জন্য, বাস্তায় তাকে সিনেমা হাউসটার সামনে নামিয়ে দেবার কথা। সিনেমা দেখাটা অবশ্য জবুরি কোনো কাজ নয়।

ললনা বলে, তুমি ট্যাক্সি করে চলে যাও বাবা। আমি বাড়ি ফিবে যাব। গাড়ির ব্যবস্থা আমরা করছি।

ভূপেন চলে গেলে ললনা বলে, আপনি তাহলে আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন ?

নিজের প্রাণ বাঁচাতে।

গাড়ির ব্যবস্থা করার দায় কেশবের ঘাড়ে চাপিয়ে ললনা অনায়াসেই বাড়ি চলে যেতে পারত কিন্তু তখন গাড়িতে বসে সে কেশবের সঙ্গে কথা বলে।

তার নিজের সম্পর্কে, তার আপনজনদের সম্পর্কে ললনার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানাবিবরণ জানবার কৌতূহল গোড়ার দিকে বড়োই বিব্রত করত কেশবকে। মনে মনে বিরক্ত হত, রেগেও যেত।

ক্রমে ক্রমে সে টের পেয়েছে ললনার দোষ নেই। তার মধ্যে এ কৌতূহল সৃষ্টি করেছে সে নিজেই। বড়োলোকের একেলে স্মার্ট মেয়ে হোক, লেখাপড়া আর গান দুয়েই দখল থাক, শিক্ষিত মার্জিত নরনারীর আসর জমিযে দেবার বিশেষ ক্ষমতা থাক, তার যে একটা হৃদয আছে সেটা অস্বীকার করলে চলবে কেন !

বাড়ির মাইনে-করা ড্রাইভার হলেও জোয়ান মানুষটার অদ্ভুত ঘর টানের মানে জানবাব কৌতূহল সে হৃদয়ে জাগতে পারে বইকী।

সারাদিন ডিউটি দিয়ে কেশব প্রায় রোজ রাত্রেই গ্রাম্য শহরতলিতে তার পুরানো ভাঙাচোরা নোংরা বাড়িতে ফিরে যায়।

শহরের শৌখিন এলাকায় ভূপেনের আধুনিক ফ্যাশানের নূতন রং-করা বড়ো বাড়ি। গ্যারেজের লাগাও ড্রাইভারের থাকবার ঘরটি ছোটো হলেও খোলামেলা ঝকঝকে তকতকে। প্রতিবছর বাড়িটির আগাগোড়া চুন ফেরানো রং লাগানো হয়, কেশবের জন্য বরাদ্দ ঘরটিও বাদ যায় না।

স্টেশন পেরিয়ে সেই কতদূরে বোসপাড়া, সেখানে ইট-বার-করা নোনায়-ধরা সেকেলে দালানের ছোটো ছোটো ঘর, আলকাতরা-মাখানো ছোটো ছোটো জানালা দিয়ে ভালো আলো বাতাস খেলে না, ঘরের ভিতরটাও ভাঙাচোরা জিনিসপত্রে বোঝাই।

ও রকম একটা ঘরে রাত কাটাতে কষ্ট করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার বদলে এখানে থাকলে রাত্রের খাওয়াটাও কেশব পায়।

বাড়ির সেই একঘেয়ে শাক চচ্চড়ি কুচো-চিংড়ির বদলে বড়োলোকের বাড়ির আধুনিক রুচিকর পুষ্টিকর সুখাদ্য। কিন্তু দেখা যায়, পরিচ্ছন্ন ঘর ও সুখাদ্যের চেয়ে বাড়ির টানটাই কেশবের ঢের বেশি জোরালো।

রাত বেশি না হলে স্টেশন পর্যন্ত ট্রাম-বাস পাওয়া যায়। কিন্তু স্টেশনের পাশ দিয়ে লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে গেলে আর ও সব বালাই নেই।

বোসপাড়া পর্যন্ত প্রায় এক মাইল রাস্তা তাকে হাঁটতে হয়। সেখানে ছোটোবড়ো নতুন পাকা বাড়ি আছে, বৈদ্যুতিক আলো আছে, সাজানো মনোহারি দোকান ও লন্ড্রি, হেয়ার-কাটিং সেলুন এ সবও আছে, কিন্তু আছে অপ্রধান হয়ে। প্রাধান্য সেখানে জরাজীর্ণ কাঁচা পাকা বাড়ির, গেঁয়ো বাঁশঝাড় ডোবা-পুকুরের সঙ্গে মেশানো শহুরে বস্তি খাটাল আর কাঁচা নর্দমার।

বাগানবাড়ি আছে দুচারটা। কিছু লোকের ছোটোখাটো বাসভবনের লাগাও একরত্তি বাগানেও শখের সুগন্ধি ফুল কিছু কিছু ফোটে। কিন্তু ফুলের গন্ধ হটিয়ে দুর্গন্ধই জাহির করে রাখে নিজেকে।

তাছাড়া আছে মশা আর মাছি। দুয়েরই অখণ্ড প্রতাপ।

তবু কেশবের ফিরে যাওয়া চাই!

বিশেষ কারণে রাত বেশি হয়ে গেলে ট্রাম-বাস মেলে না, কেশব হেঁটেই রওনা দেয়। ললনাদের বাড়ি থেকে স্টেশনও প্রায় আধমাইল রাস্তা।

ফিরে আসতে হয় খুব ভোরে। অনিমেষের তিয়াত্তর বছরের বুড়ি মা কে রোজ সকালে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতে হয়।

কেশব বিয়ে করেনি।

অর্থাৎ আলোয় ঝলমল খোলামেলা পরিচ্ছন্ন এলাকায় সুন্দর বাড়িতে এমন সুবিধাজনক একটি ঘর থাকতে, ভালো খাওয়া পাওনা থাকতে, নিজের বাড়িতে আপনজনের মধ্যে শুধু কয়েক ঘণ্টা ঘুমোনোর জন্য ফিরে যাওয়া!

তার কী কোনো মানে হয়?

সেকেলে গেঁয়ো স্বভাবের একগাদা আপনজন। মা-বোন মাসি-পিসি ভাই ভাজদের যে সংসারে নিজে সে প্রায় পরের মতো হয়ে গেলেও যারা আজও তার আপনজন।

জখম গাড়িটাকে টেনে গ্যারেজে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হলে ললনা বলে, চলুন না দুজনে সিনেমায় যাই? গাড়িটা যখন নেই, আমি গাড়ির মালিকের মেয়ে আর আপনি ড্রাইভার এ তফাতটাও এখন ভুলে যাওয়া যেতে পারে।

বোঝা যায়, এটা তার ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ বলে-বসা প্রস্তাব নয়। এতক্ষণ তাকে জেরা করে করে আলাপ চালিয়ে যাবার সময় কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করছিল।

কেশব আমতা আমতা করে বলে, ছুটি যখন পেয়ে গেলাম, বাড়ি ফিরব ভাবছিলাম।

ললনা আহত হয় না, রাগও করে না, আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়।

বলে, আমি শিগগির একদিন যাব আপনার বাড়িতে, দেখে আসব কী আছে সেখানে, বাড়ি যেতে আপনি এত পাগল কেন। সিনেমা দেখে বাড়ি গেলে চলে না?

সিনেমা দেখতে আমার বিশ্রী লাগে।

বিশ্রী সিনেমা দেখতে যান বলে। বন্ধুরা কত টানাটানি করে আমি ও সব সস্তা সিনেমায় কখনও যাই দেখেছেন?

কেশব ম্লান মুখে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, একটা সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবেন? আমার কীরকম অস্থির অস্থির করছে মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে।

ললনার মুখ বিবর্ণ দেখায়।

আপনার কি কোনো অসুখ আছে? আপনার চেহারা দেখে তো

কোনো অসুখ নেই। ডাক্তার তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করেছে কোনো খুঁত খুঁজে পায়নি। কষ্ট যেটা হয় সেটাও অদ্ভুত। মাথা ঘোরা নয়, এমনই যন্ত্রণা নয়, ভেতর থেকে কী যেন চাপ দেয়। আমার এখন কী মনে হচ্ছে জানেন? কোথাও ছুটে পালাই।

ললনা ম্লানমুখে বলে, তাহলে বাড়িই যান।

কেশব চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটু ভাবে।

হঠাৎ বলে, আচ্ছা চলুন তো সিনেমাতেই যাই আপনার সঙ্গে দেখি কষ্টটা কমে কি না। প্রশ্রয় না দিয়ে এটাকে জয় করার চেষ্টা করা যাক।

খুব বেশি কষ্ট হলে

দেখি কী হয়।

দুজনে সিনেমায় যায়।

হাফ টাইম পর্যন্ত কোনো রকমে অপেক্ষা করে কেশব বলে, আমি আর পারছি না।

ললনা বলে থাক। আমিও আর দেখব না, ভালো লাগছে না। র . আপনার আসবার দরকার হবে না।

তারপর বলে, আমি ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরব, সে পর্যন্ত আমার সঙ্গেই আসুন।

তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে। ডুপেনের আলোয় ঝলমল বাড়িটার সামনে নেমে কেশব আরেকবার জিজ্ঞাসা করে, কাল তাহলে না এলে চলবে?

ললনা বলে, কাল এসে কী করবেন? এবার নিজেরা দেখে শুনে একটা নতুন গাড়ি কিনতে হবে। পরশুর আগে বাবার সময় হবে না।

ললনা এমনইভাবে কথা কয় যেন কেশবের মতো তারও . . ভিতরে কিছু চাপ দিচ্ছে।

কেশব ট্রামে স্টেশন পর্যন্ত যায়। স্টেশনের পাশে লেভেল ক্রসিংটা পার হলেই শহরতলির একেবারে অন্যরকম চেহারা।

রেলপথটা আলোয় ঝলমল বড়ো বড়ো অট্টালিকার শহর আর নোংরা পুরানো জীর্ণ ঘরবাড়ি আধো অন্ধকার শহরতলিকে পৃথক করে রেখেছে। এ পারে সীমা কর্পোরেশনের, ও পারে আরম্ভ মিউনিসিপ্যালিটির।

দুপুরে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। ধুলো আর গোবরে রাস্তাটা প্যাঁচপ্যাঁচ করছে। এখানে ওখানে গর্ত, সেগুলিতে জলের বদলে জমেছে পাতলা তরল কাদা।

তবু কী ভিড় মানুষের!

শুধু ময়লা জামাকাপড়-পরা বা অর্ধ উলঙ্গ গরিব মানুষের ভিড় নয়। ফিটফাট বেশধারী বাবু মানুষ, স্যুটপরা সাহেব মানুষ এবং ভালো শাড়িপরা ভদ্রমহিলাও এই পথে হাঁটছে, দুপাশের দোকানে কেনাকাটা করছে। খানিক এগিয়েই সিনেমা। শো চলছে, ভিতরটা বোঝাই, তবু বাইরে গিজগিজ করছে সব বয়সের ভদ্রাভদ্র মেয়েপুরুষ।

পরের শো-র টিকিটের প্রয়োজনে এত আগে এসে ধন্না দিয়েছে।

চেনা মানুষ শুধায়, আজ সকাল সকাল?

কেশব বলে, ছুটি পেয়ে গেলাম।

অফিস করা শ্রান্ত চেনা মানুষ মন্তব্য করে, তোমার তো ভাই আবামের চাকরি ! পরের মোটরে চেপে বেড়াও, খেয়ে-দেয়ে খাটিয়ায় শুয়ে নাক ডাকাও।

কেশব মুখ বাঁকায়।

করে দেখলে আরাম টের পাওয়া যায়। বাবু হুকুম দেবে, জোরসে চালাও। জোরসে চালিয়ে মানুষ চাপা দিয়ে তুমি শালা মার খাও আর জেলে যাও। কত আরাম !

এগোতে এগোতে আরও কমে আসে রাস্তার আলোর জোর, দোকানপাটের দেখা মেলে দূরে দূরে, বাড়িগুলির গ্রাম্যতা আর জীর্ণতা বেড়ে যায়। এবড়ো-খেবড়ো খোয়ায় তৈরি এই প্রধান রাস্তা থেকে দুপাশে পাড়ার মধ্যে ঢুকে গেছে ইটের গলিগুলি। বাগদিপাড়ার ফাঁকা জায়গায় বাজারটা খাঁ-খাঁ করছে দেখা যায়। এখানে সকালে একবেলা বাজার বসে।

বোসপাড়ার মোড়ে বিবর্ণ থামটার মাথায় টিমটিম করে জ্বলছে একটা অল্প পাওয়ারের বালব। এ যেন বাঁশঝাড় ডোবা-পুকুর এলাকার মানুষগুলিকে জানিয়ে দেওয়া বৈদ্যুতিক আলো জ্বললেই কী এসপ্ল্যানেডের মতো আলোয় ঝলমল করে ?—এটাও বৈদ্যুতিক বাতি, এদিকে তাকিয়ে ঘরের ডিবরি আর লণ্ঠন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো।

সন্ধ্যাদীপ জ্বালো ভেজাল তেল দিয়ে, ছেঁড়া ন্যাকড়ার সলতে পাকিয়ে। সে আলোতে শান্তি আছে, স্নিগ্ধতা আছে ! এটা তো নিছক কাচের খেলনার আলো।

কেশব একটু দাঁড়ায়। এখন মনে হয়, কত দূরে যেন ভেসে এসেছে লেভেল ক্রসিংয়ের ও পারে ললনাদের শহর, মন থেকে যেন প্রায় মুছে গেছে চোখ-ঝলসানো আলো, শহরের জমকালো রূপ আর গাড়ি ও মানুষের কলরব।

সে-ও ওই ধোঁকাবাজিতে বিশ্বাস করে—সভ্য জগতের সভ্য জীবনের কোলাহল থেকে দূরে পালিয়ে শান্তি ও স্নিগ্ধতা খোঁজার ধোঁকাবাজিতে। নইলে ললনার অত আগ্রহ সত্ত্বেও সিনেমা শো-টা শেষ পর্যন্ত না দেখে কীসের আকর্ষণে সে ছুটে এল এই আধা-অন্ধকার ডোবার সোঁদা দুর্গন্ধে ভারী বাতাসের গেঁয়ো এলাকায় ?

শরতের মনোহারি ও মুদিখানা মেশানো দোকানের বাল্‌বটা জোরালো আলোই দেয়। কেশব দোকানে দুপয়সার নস্য কিনতে যায়।

নস্য দিয়ে শরৎ তার হাতে একটা ঠোঙা দেয়, বলে, গুড়টা বাড়িতে পৌঁছে দেবে ? ছোঁড়াছুঁড়িগুলি কী মিষ্টিটাই খেতে পারে !

প্রৌঢ় শরতের মুখে একটা শান্ত নিরুত্তেজ ভাব, জীবনে তার যেন কোনো রসকষ নেই। স্থানীয় স্কুলে বাংলা পড়ায় আর এই দোকানটা চালায়, নীরস একঘেয়ে হয়ে গেছে তার জীবনের লড়াই।

শরতের দোকানের পাশ দিয়ে কেশব দক্ষিণ দিকে বোসপাড়ার রাস্তায় ঢোকে। বোসপাড়ায় ছাড়া ছাড়া থোক থোক ঘন বসতি। কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি হয়তো আট-দশটি বাড়ি, তার পরে খানিকটা ফাঁকা মাঠ পুকুর বাগান ঝোপ জঙ্গল।

বড়ো বড়ো বাড়িগুলি আর নতুন যে বাড়ি উঠেছে সেগুলিই কেবল পুরানো বাড়ির কোনো একটা কোণে না ঘেঁষে কমবেশি তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে।

শহরে এখন রাত বেশি হয়নি। আলো নিভিয়ে বোসপাড়া ঘুমিয়ে না পড়লেও অনেকটা নিঝুম হয়ে এসেছে, রাস্তায় লোক খুব কম। মাঝে মাঝে কোনো দাওয়ায় বসেছে কয়েকজনের আড্ডা, কোনো বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়ের চেঁচিয়ে পড়া, মুখস্থ করা, দু-একটা বাড়িতে আবার কিন্তু রেডিয়ো বাজছে।

প্রকাণ্ড বটগাছটার লাগাও সাদা চুনকাম করা চৌকো একতলা বাড়িটা আবছা আঁধারে বড়োই রহস্যময় দেখায়, সংলগ্ন আটচালা দুটো সে রহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। ভিতরে আলো জ্বলছে, মানুষের গলার আওয়াজ বাইরে ভেসে আসছে, নাকে এসে লাগছে রান্নাঘরের সম্বরার গন্ধ। তবু তারাভরা নীলাকাশ যেমন প্রকাশ্য হয়েও রহস্যময়, বৈশাখী গুমোট সন্ধ্যায় নিথর জমকালো বটগাছটা যেমন জীবন্ত হয়েও মৃতের মতো ভয়ের রহস্যে ঘেরা, তেমনই সাধারণ ইটের বাড়িটির ছায়াচ্ছন্ন শুভ্রতা যেন ছায়ালোকের প্রতীকের মতো রহস্যানুভূতিকে নাড়া দেয়।

দালানটার ভিতরে ছোটো একটু উঠান আছে। এদিকে বেড়ায় ঘেরা বাগান। মাচা আছে তিনটি, লাউ কুমড়ো আর উচ্ছে গাছের। কয়েকটা জবাগাছে ফুলও ফোটে।

রান্না হয় দালানের একটু তফাতে কাঁচা চালাঘরে।

দালানের ভিতরে না গিয়ে বাগান দিয়ে রান্নাঘরে যাওয়া যায়।

মায়া উনানে তরকারি চাপিয়ে শরতের ছেলে গণেশের গায়ের ঘামাচি মারছিল, কেশবকে দেখে তার মুখে একটু অদ্ভুত রকম শান্ত আর মিষ্টি হাসি ফোটে।

কেশব বলে, শরৎদা গুড় পাঠিয়েছে।

গুড়ের ঠোঙাটা রেখে মায়া গণেশের চিবুকে চুমু খেয়ে বলে, এবার পড়বে যাও তো মানিক। আর পাহারা দিতে হবে না।

দালান কাছেই, মানুষ কথা বললে শোনা যায় কিন্তু সন্ধ্যার পর চালাঘরে একা রাঁধতে মায়ার ভয় করে। একজনকে তার সঙ্গে থাকতে হয়।

চালার এপাশে কাছাকাছি আর বাড়ি নেই, গাছপালা জঙ্গল আর পুকুর। তার ওদিকে কেশবের বাড়ি।

কেশব তামাশা করে বলে, সন্ধ্যারাতে এত ভয় ?

মায়া বলে, ভয় করবে না ? ওই আঁধার জঙ্গল, গণেশ ছিল তবু গা-টা ছমছম করছিল।

বছরখানেক আগেও ডিবরি জ্বলত এ ঘরে, আজকাল শালের খুঁটির গায়ে বসানো ল্যাম্প আলো দেয়।

মায়া বলে, মুখ শুকনো দেখছি ? খুব খাটিয়েছে বুঝি আজ ?

না, সারা দুপুর ঘুমিয়েছি।

তবে ?

একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।

ল্যাম্পের রঙিন আলোয় ঠিক বোঝা যায় না কী রকম পাংশু বিবর্ণ হয়ে গেছে মায়ার মুখ। চোখে পলক নেই আর ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে দেখে অনুমান করা যায় সে কী রকম ভড়কে গেছে।

মায়া রূপসি কিনা বলা কঠিন। তবে তেল-চকচকে একরাশি কালো চুলে ঘেরা শ্যামল রঙের মুখখানায় তার লাবণ্য ঢলঢল করছে। সস্তা তাঁতের শাড়িটাই যেন তাকে ভালো মানিয়েছে।

কেশব হেসে বলে, কী হল ?

মায়া ঢোক গেলে।

চাপা সুরে বলে, ওই আবার কালী আসছে। দুদণ্ড ভালো করে কথা কইবার উপায় নেই।

শরতেব মেয়ে কালীর বয়স বছর এগারো, এই বয়সেই সে ইজের ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। ডুবে শাড়ির আঁচল লুটিয়ে বেণি দুলিয়ে এসে কেশবের দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে সে মায়ার কাছে আবদার জানায়, খিদে পায় না, ঘুম পায় না মাসিমা ? কত রাঁধবে তুমি ?

মায়া ঝংকার দিয়ে বলে, বান্না বাকি আছে নাকি আমার ? এবার তরকারি নামাব। ডেকে আন গে সবাইকে, ঠাঁই করে নিয়ে বোস। লণ্ঠন আনিস।

ভাইবোনদের ডেকে আনতে কালী দালানের মধ্যে অদৃশ্য হতেই মায়া চট করে কাছে এসে বলে, বুকটা ঢিপঢিপ করছে। এ কাজ ছাড়তে হবে তোমাকে। কী হয়েছিল সব যতক্ষণ না শুনচি বুকের কাঁপুনি যাবে না। এক কাজ করো, জামাকাপড় ছেড়ে এসে দালানে সবাইকে বলবে ঘটনা কী হয়েছিল, আমিও শুনব। কালী ছুঁড়ি দেখে গেল, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা কইলে দিদি আবাব ঝাড়বে।

কেশব বাগান দিয়ে ঘুরে রান্নাঘরে এসেছিল এবাব সে দালানে ভিতর দিয়ে ফিরে যায়।

দালানের ভিতরে বারান্দায় শরতের বড়োছেলে রঞ্জন পড়ছিল, কেশবকে দেখে সে বলে, কেশবদা কোন দিক দিয়ে এলে ?

কেশব বলে, শবৎদা ঠোঙায় গুড় দিয়েছিল, বান্নাঘবে মায়াকে দিয়ে এলাম।

ঘর থেকে অবলা জিজ্ঞাসা করে, কেশব নাকি ? বসবে না ?

অবলার হয়েছে পক্ষাঘাত। আজ বছর তিনেক দিবারাত্রি তাব বিছানায় শুয়ে কাটছে। সেটাই বোনকে আনিয়ে কাছে রাখার কারণ, তাব আধ-ডজন ছেলেমেয়ের সংসাবটা মায়াকে দেখাশোনা করতে হয়।

কেশব বলে, আজ একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটে মবছিলাম প্রায়। জামাকাপড় ছেড়ে এসে বলছি ব্যাপার।

কেশবের বাড়িতে অনেক লোক। তার বিধবা মা, তিন ভাই, দুটি বোন, মেজোভায়ের বউ, তাব দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে, একজন পিসি ও তাব ছেলে।

ছোটো ছোটো কুঠরি আছে অনেকগুলি। কেশব একা একখানা ঘর দখল কবলেও ঘবেব জন্য অসুবিধা হয় না। তবে কেশবের সেজোভাই প্রণব এবং পিসিব ছেলে ভোলাব বিয়ে হলে ঘরের টানাটানি পড়বে।

পিসি পারলে রাত পোহালেই ছেলের বিয়ে দেয়। কেশবের ভয়ে কিছু কবতে পাবে না। কে জানে কীরকম বিবেচনা কেশবের ! ব্যাটাছেলে তো রোজগার করবেই একদিন— চাকরি পেয়ে হোক, ফিরিওলাগিরি কুলিগিরি করেই হোক। পাকাঘরে দুধে-ভাতে কিংবা কুঁড়েতে আধপেটা শাকভাত খেয়ে জীবন কাটাবে, যেমন অদৃষ্টে আ'ছ।

কিন্তু বয়স গেলে যে বিয়ে করাব সুখটাই নষ্ট হয়ে গেল জীবনে ? দুদিনের জন্য হলেও এই তো বয়স বিয়ের, আসল রস আর আনন্দ পাবার।

জীবনটাই তো অস্থায়ী মানুষের।

কেশবের নিজের ফসকে গেছে কিনা, অন্যের জীবনে এ রস আর আনন্দের কোনো দাম তার কাছে নেই।

শহর থেকে এটা-ওটা আনার ফরমাস ছিল দু-তিনজনের। বিমলা জিজ্ঞাসা করে, খালি হাতে এলি, পাটি আনিসনি তো ?

কেশব বলে, না। আমি বলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে মরছিলাম—

মাগো ! বলিস কী রে ? ভগবান দীনবন্ধু !

ফরমাশি জিনিস না আমার জন্য যারা অনুযোগ দেবার জন্য উদ্যত হয়েছিল তারা একেবারে চুপ করে যায়।

সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে কেশব পুকুরে গিয়ে স্নান করে আসে। তাড়াতাড়ি না যাওয়াই ভালো। আধ-ডজন ছেলেমেয়েকে খেতে বসিয়েছে, ওরা খেয়ে না উঠলে মায়া এসে শুনতে পাবে না তার দুর্ঘটনার কাহিনি।

অনেকটা দেরি করে গিয়ে সে দেখতে পায়ে শরৎ ইতিমধ্যে দোকান বন্ধ করে বাড়ি এসেছে।

সে বলে, অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে নাকি শুনলাম ? তুমি যে বাড়ি সুদ্ধ আমাদেব ভাবিয়ে রেখে গেলে।

মাদুর পেতে তাকে বসতে দেওয়া হয়।

ঘর থেকে অবলা বলে, একটু জোরে জোবে বলো কেশব। তোরা কেউ টু শব্দটি করবি না।

কেশব দুর্ঘটনার কথা বলে যায়, শরতের চার বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে মায়া কাছে বসে শোনে।

লণ্ঠনের আলোয় বিবর্ণ মুখ দিয়ে অস্ফুট ভয়ের আওয়াজ বার হয়।

তার কাহিনি বলা শেষ হলে অবলা বলে, তবু ভাগ্যি !

মায়া শুধু বলে, হাত-পা জখম হতে পারে, প্রাণ যেতে পারে, এমন কাজ না করলেই হয় !

কাজ না করলে খাব কী ?

আর কী কাজ নেই জগতে ?

যে কাজ জানি সেটাই করছি। অ্যাকসিডেন্ট হয় বলে লোকে মোটর হাঁকাবে না ?

এত দরদ এত সহানুভূতি নিজের বাড়িতে এবং এই পরের বাড়িতেও ! তবু যেন আর প্রাণটা ভরতে চায় না কেশবের। কেমন বিস্বাদ হয়ে যায় সব কিছু।

বাড়ি যাওয়ার সময় যেন ওজন আরও বেড়ে গেছে মনে হয় বিষাদ ও অবসাদের। আরও নিঝুম হয়ে গেছে বোসপাড়া, ঘরে ঘরে জীবনকে গুটিয়ে নিয়েছে মানুষ। কীসের টানে সে ছুটে এসেছিল ব্যাকুল হয়ে ? এত শান্ত ও রিক্ত চারিদিকের জীবন এখানে। এই বিষাদ আর অবসাদ নিয়ে সহজে ঘুম আসবে না, ভোঁতা রাত্রি জেগে শুনবে ঝিঁঝির ডাক।

খেয়ে উঠে কেশব নিজের ঘরে যায়। ঘরেরটি ছাড়া বাড়ির অন্য আলো এবং শরতের বাড়ির আলো প্রায় একসময়েই নিভে যায়।

আলো হয়তো জ্বালা আছে কোনো কোনো বাড়ির ঘরে কিন্তু সে আলো জ্বলছে অন্য প্রয়োজনে, তার মতো ঘুম আসে না বলে অগত্যা কিছু পড়ার জন্য আলো জ্বালিয়েছে ক-জন ?

জঙ্গলের দিকের জানালার বাইরে থেকে মায়ার চাপা গলার কথা শুনে কেশব চমকে যায় !

শুনছ ? একটা কথা শোনো ?

মায়া ? তুমি ?

আলোটা নিভিয়ে দাও।

কেশব আলো নিভিয়ে জানলার কাছে সরে। মায়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি এই জঙ্গল দিয়ে একা এলে ?

কী করব ? তুমি তো রাত থাকতে উঠে কাজে চলে যাবে।

কাল আমার ছুটি। তোমার ভয় করল না ?

করল বইকী। বড়ো ভয় দিয়ে ছোট্ট ভয় ঠেকিয়ে চলে এলাম। কেশব একটু ভেবে বলে, ঘরে আসবে ? না আমি বাইরে যাব ? মায়া বলে, তুমি যা বলো।

থাক, আমিই আসছি। কে কোন ঘর থেকে দেখে ফেলবে ঠিক নেই। আমায় যেতে দেখলে ভাববে ঘাটে যাচ্ছি।

খিড়কি খুলে কেশব বেরিয়ে যায় ! কিছু তফাতে সরে গিয়ে তেঁতুলগাছটার তলায় গাঢ় অন্ধকারে তারা দাঁড়ায়।

কী ব্যাপার মায়া ?

আমি থাকতে পারলাম না। আমার দম আটকে আসছিল। আমায় কথা দাও এ কাজ তুমি ছেড়ে দেবে।

টের পাওয়া যায় মায়া কাঁদছে।

কেশব নিশ্বাস ফেলে বলে, তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন ? গাড়ি মেরামত হতে গেছে, কাল দিনটা আমার তো ছুটি।

কান্না থামিয়ে মায়া বলে, ও !

তারপর উদ্‌বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বিরক্ত হলে মনে হচ্ছে ?

পাগল। তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছ। চলো তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

আবছা ভোরে কেশব পুকুরে গিয়ে নেয়ে উঠে ঘাটে দাঁড়িয়ে পা মুছছে, মায়া একটা গ্লাস হাতে করে এসে বলে, চট করে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলো।

গ্লাসে একপোর বেশি দুধ।

এ আবার কী ব্যাপার ?

যে গাইটা বিইয়েছিল, আজ থেকে তার দুধ খাওয়া হবে। রোজ খানিকটা টাটকা দুধ খেতে হবে তোমায়।

কেশব বলে, সে তো বুঝলাম, কিন্তু দুধ কম পড়লে বাড়িতে কী বলবে ?

মায়া হেসে বলে, কত খেয়াল রাখছে বাড়ির লোক। গাইটাও তো দুইতে হবে আমাকেই। খেয়ে নাও, কে কোথা থেকে দেখবে।

অগত্যা দুধের গ্লাসে কেশবকে চুমুক দিতে হয়। বাচ্চা বাছুর, দুধ খুব পাতলা। কিন্তু ঠিক সে জন্য যেন নয়। মায়ার এই গায়ে পড়ে দরদ করার জন্যই যেন তার লুকিয়ে আনা দুধটা বিশেষ রকম বিস্বাদ লাগে কেশবের কাছে।

এত ভোরে নাইছ কেন ?

শহরে যাব।

আজ না তোমার ছুটি ?

অন্য কাজে যাব।

এটা বানানো কথা। কেশবের কাজ কিছুই নেই।

ভিতরটা অস্থির হয়ে উঠেছে শহরে যাবার জন্য তাই কেশবকে যেতে হবে। সে অনুভব করে ভিতরে কী যেন প্রচণ্ডভাবে চাপ দিচ্ছে, মনে হচ্ছে পাগলের মতো ছুটে চলে যায় লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে শহরের দিকে। কর্মব্যস্ত শহরের কলরব কানে না এলে, দামি ফুলের বাগান ও লনের ধারে গ্যারেজের পাশে তার পরিচ্ছন্ন ঘরখানায় বসে বাড়ির ভিতর থেকে ললনার গানের সুর ভেসে আসা না শুনলে তার যেন দম আটকে যাবে।

কিন্তু কেশব জানে, সারাদিন পর আবার সে পাগল হয়ে উঠবে আলোকোজ্জ্বল শহর থেকে এই অন্ধকার বোসপাড়ায় ফিরে আসার জন্য। লেভেল ক্রসিংয়ের দুটি দিক পালা করে তাকে কাছে টানবে আর দূরে ঠেলে দেবে।

ধাত

একটা নতুন বাড়ি উঠছে শহরতলিতে। খাস শহরে স্থানাভাব হলেও আনাচে-কানাচে এবং শহরের আশেপাশে বাড়ি তো উঠছে কতই। কাঠা তিনেক জমিতে ছোটোখাটো এই দোতলা বাড়িটা কিন্তু উঠছে আমাদের গল্পের জন্য।

বাড়িটা উঠছে তরুণী অমলার, বিনোদেব টাকায়। নিজের আপিসে প্রায় বিনা খাটুনিতে একটা চাকরি তাকে বিনোদ দিয়েছে। কিন্তু অমলা জানে বূপ যৌবন আজ আছে কাল নেই। বিনোদের আপিসের চাকরি আরও অনিশ্চিত, বিনোদ যখন খুশি যাকে খুশি বিদায় করে। তার চাকরি করার ছ-মাসের মধ্যে তিনজনকে সে ছাঁটাই করেছে, তাব মধ্যে দুজন পুরানো লোক।

অথচ এদিকে একটা মুখোশ আছে প্রেমের, নগদ টাকা নেওয়া যায় না। মুখোশটা তারা দুজনেই বজায় রেখেছে নিজের নিজের সুবিধাব জন্য। বাড়ি নেওয়া যায়। অন্য লোকের এত বাড়ি তৈরি করে দিয়ে দিয়ে বিনোদ ফেঁপে যাচ্ছে, তাকে একটা ছোটোখাটো বাড়িই করে দিক। সকলকে নিয়ে মাথা গুজবার স্থায়ী একটা ঠাঁই, নিশ্বাস ফেলে ফেলে মাসে মাসে ভাড়া-গোনা থেকে রেহাই।

ভিতের পর গাঁথনি শুরু হয়ে গেছে। রাজমিস্ত্রি খাটছে দুজন, সাদেক আর পণ্ডিত। সাদেক পাকা রাজমিস্ত্রি, এটাই তার বংশগত পেশা। বিনোদের ফার্মের সে বাঁধা লোক। এ রকম ছুটকো বাড়ি গাঁথার কাজে বিনোদ তাকে সাধারণত লাগায় না, কিন্তু অমলার কথা ভিন্ন।

ভালো মালমশলা আর ভালো মিস্ত্রি দিয়ে বাড়িটা না করে দিলে অমলা অভিমানেব ছলনায় ঝঞ্ঝাট বাড়াবে।

পণ্ডিত ক-বছর আগেও মজুর খাটত। মশলা মেশাবার কাজে সে ছিল ওস্তাদ। যুদ্ধের পর বেড়ে গেছে বাড়ি করার হিড়িক। যুদ্ধেব সময়কার কাঁচা পয়সা এবং ঘুষ ও চোরাবাজারের পয়সার নামে বেনামিতে বাড়ির বূপ নেবার ঝোঁকের সঙ্গে যোগ হয়েছে পাকিস্তান থেকে ব্যাবসা গুটিয়ে ভিটেমাটি বেচে চলে আসা মানুষগুলির সবার আগে একটা ভিটেব ব্যবস্থা করাব ঝোঁক।

বাড়ির জন্য এমনই প্রাণে খাঁ-খাঁ করে এদের যে তৈরি বাড়ি কিনতে পেলে যেন বর্তে যায়। বিনোদের মতো মানুষেরা এটা কাজে লাগাতে কসুর করেনি। সে একাই ওচা মাল আর পচা মশলা দিয়ে চটপট যেমন তেমন করে গেথে তোলা বাড়ি বেচে ও রকম সাতজন বাড়ি-পাগল মানুষেব সম্বলে মোটা ভাগ বসিয়েছে।

ওই বাড়িগুলি গাঁথবার সময় বড়োই সে বিরক্ত হয়েছিল সাদেকের উপর।

তোমায় বারবার বলছি অত নিখুঁত কাজে আমার দরকার নেই, স্পিড বাড়িয়ে দাও, চটপট তুলে দাও—কিছুতে তুমি কথা শুনবে না!

ও রকম কাজ করতে শিখিনি বাবু। যেমন শিখেছি, তেমনই কাজ করছি।

পাকাপোক্ত বাড়িও গেঁথে দিতে হয় হিসেবি পাকা লোকের শ্যেনদৃষ্টির সামনে, সাদেককে তাই বিনোদ ছাড়তে পারেনি।

রাজমিস্ত্রির ওই চাহিদার সময় মোটামুটি কাজ শিখেই পণ্ডিত হয়েছিল রাজমিস্ত্রি। সাদেকের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলেও কাজ পণ্ডিত ঠিকমতোই করে যায়। সাদেকের চেয়ে সে বরং তাড়াতাড়ি কাজ এগিয়ে দিতে পারে, যদিও গাঁথনি হয় একটু কম মজবুত।

পণ্ডিত তার আসল নাম নয়। পাণ্ডিত্য বা পণ্ডিতেব বংশে জন্মানোর জন্য তার এ নাম হয়নি। পণ্ডিতদের মতোই সব বিষয়ে সব প্রশ্নের যেমন হোক একটা মানে করে দেয় বলে কে একজন তামাশা করে তাকে পণ্ডিত বলে ডাকতে শুরু করেছিল, সকলের কাছে তার এখন এটাই নাম দাঁড়িয়ে গেছে।

এখনও ভারা বাঁধার দরকাব হয়নি, দেয়াল এখনও কোমরের নীচে। নীচে দাঁড়িয়েই মশলা ঢেলে ইট সাজানো যায়। ভগলু বালতি করে জল এনে ইট ভিজিয়ে দেয়, জগদেও মশলা মেখে কড়াইতে ভরে। মাথায় করে ইট আর মশলাব কড়াই নিয়ে টিকিন মিস্ত্রিদের জোগান দেয়। ছোকরা রাখাল খাটে ফুটফাট ফরমাশ।

এদের টাইমের কাজ। রতন আর জগন্নাথ সকাল সকাল এসে ইট ভেঙে ছোটোবড়ো খোয়া করতে লেগে যায়—সারাদিন তাদের হাতুড়ি দিয়ে ইট ভাঙা চলে, রোদ চড়লে খোয়ার স্তূপে একটা শিক ঢুকিয়ে মাথাব উপর ছাতি বেঁধে নেয়। তাদের চুক্তির কাজ। কয়েকদিন খোযা ভাঙার পব একফুট উঁচু আর চারকোনা করে সাজিয়ে দেবে, মাপজোখ হবার পর স্কোয়ারফুট হিসাবে মজুবি পাবে।

হরে-দরে টাইমের মজুরদের সমানই দাঁড়ায় তাদের মজুবি।

টিকিনের মাথায় রাশীকৃত চুলের মস্ত খোঁপা, হাতে মোটা মোটা রুপার বালা এবং সাবাদেহে নানাপ্যাটার্নের উলকির নকশাকাটা।

টিকিন পণ্ডিতেব সঙ্গে থাকে। এই বয়সেব যুবতি মেয়ের পক্ষে একজন পুরুষেব সঙ্গে থাকাই নিয়ম। একা থাকতে চাইলে তার মানে দাঁড়াবে যে সে দশটা পুরুষেব সঙ্গে বজ্জাতি কবাব স্বাধীনতা চায়, বেশ্যা হয়ে যেতে চায়। তা সে খুশি হলে হতে পাবে কিন্তু যথানিয়মে দেহের দোকান খুলতে হবে, দশজনেব সঙ্গে খেটে খাওযার সম্মান বজায় রাখা চলবে না। আরও দশটা মেয়ে তো খেটে খাচ্ছে, বাচ্চা-কাচ্চার ঝামেলা পোযাচ্ছে, তাদের সাথে থেকে তাদের মরদদেব সঙ্গে খেলা করার অধিকারও টিকিনের থাকলে চলবে কেন ? নিয়ম তো থাকা চাই সংসারে। একজন পুরুষেব সঙ্গে থাকলে সে তাকে সামলে রাখবে, বেইমানি করতে দেবে না।

একজনের সাথে বনিবনা না হলে ছাড়াছাড়ি হবে, আবেকজনের কাছে যাবে। কিন্তু তাকে থাকতেই হবে একজন পুরুষের সঙ্গে।

পণ্ডিত অবশ্য তাকে খাটতে না দিয়ে পুষতে পারে—বউয়ের মতো। বিয়ে করা বউটা বেঁচে থাকলে সে যেমন আর খাটতে যেত না, ঘরে রেখে তাকে পুষতে হত। স্বামী স্ত্রীতে খাটা অবশ্য নিষিদ্ধ নয় মোটেই। ভগলু জগদেও রতন জগন্নাথ সকলেব বউ ঘর ছেড়ে খাটতে যায়, কেউ টাইমের কেউ ঠিকাকাজে।

কিন্তু পণ্ডিতের হল রাজমিস্ত্রির রোজগার, তার বিয়ে-করা বউ বাইরে খাটতে যেতে রাজি হবে না, বউকে খাটাবার অধিকারও তার নেই।

এবং ঠিক এই জন্যই টিকিনকেও সে জোর করে বলতে পারে না যে তোর খাটতে গিয়ে কাজ নেই, আমি তোকে ঘরে রেখে পুসব।

টিকিন নিজেই রাজি হবে না।

স্বেচ্ছায় সে পণ্ডিতের সঙ্গে আছে। অন্য পুরুষ নিয়ে বেইমানি করা ছাড়া, পণ্ডিতের বেশি রোজগারে ভাগ বসানোর জন্য খানিকটা বাধ্যবাধকতা ছাড়া, খুশিমতো চলাফেরার অধিকার, যখন ইচ্ছা পণ্ডিতকে ছেড়ে যাবাব অধিকার পুরোমাত্রায় বজায় আছে।

শাস্ত্রমতে আইনমতে বা প্রথামতে বিয়ে-করা বউ ঘরে বসে খেলেও তার কতগুলি বিশেষ অধিকার থাকে। পোষা হয়ে থাকলে কিন্তু টিকিন বিয়ে-করা বউয়ের এই বিশেষ অধিকারগুলিও পাবে

না, নিজেব বিশেষ অধিকাবগুলিও হাবাবে। পণ্ডিতকে যখন খুশি ছেড়ে যাবাব অধিকাব পর্যন্ত সে হাবিয়ে বসবে।

ছাড়তে চাইলেই পণ্ডিত বলবে, অ্যাদ্দিন যে পুষেছি, সেটা শোধ দিয়ে যাবি।

তবু জোব কবে যেতে চাইলে পণ্ডিত যদি তাব বালা থেকে গায়েব কাপড় পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে ঘাড়ে ধবে বাস্তায় ঠেলে দেয়, লোকে তাকে দোষ দেবে না।

বলবে, ঠিক কবেছে। এতদিন ঘাড় ভেঙে খেয়ে পবে আবামে থেকে আজ মাগি বেইমানি কবছে।

বউকে টাইমে খাটতে পাঠায় যে ভগলু, সে ও হয়তো বেগে গিয়ে থুতুব সঙ্গে মুখেব খইনিটা পর্যন্ত ফেলে দিয়ে বলবে, তেবা শবম নেহি লাগতা ? কুত্তী সে ভি নাচা হো গিয়া ?

সবাই সায় দেবে তাব কথায়। সবাই জেনে যাবে মানুষেব সব চেয়ে বড়ো দোষটা আছে টিকিনেব মধ্যে, সে নিমকহাবামি কবে।

সাপেব মতো যে তাকে পোষে তাবেও সে সুযোগ পেলে দংশায়।

কাজেব তদাবক কবে আব দিনান্তে মিস্ত্রি মজুব মজুবনিব মজুবি মিটিয়ে দেয় কার্তিক। বিনোদেব কী বকম এক .বোনে. .' ছেলে, একটা পা তাব একটু বাকা, চেবা ঠোঁটেব জন্য পান বাঙা বড়ো বড়ো দাঁতগুলি সর্বদা বেবিয়ে থাকে। সম্পর্কেব হিসাবেই সে বিনোদেব আশ্রয়ে থাকে কিন্তু বিনোদ কাউকে বিনামূল্যে আশ্রয় দেওযাব মানুষ মোটেই নয়,--খাওয়া পবা মাথা গুঁজে থাকাব ভাড়া সব কিছুব অনেক বেশি দাম কার্তিককে খাটিয়ে তুলে নেয়।

খানিক তফাতেব আমগাছটাব ছায়ায বসে সে তাদেব কাজ দ্যাখে বিড়ি টানে ঝিমোয়, বুকাবেব বাটিতে আনা বুটি তবকাবি খেয়ে লম্বা ঘুম দেয়, আজ এ বাড়ি কাল ও বাড়ি থেকে খববেব কাগজ চেয়ে এনে পড়ে।

কাজেব ফাকে টিকিন গিয়ে আবদাব জানায়, একটো বিড়ি হোবে বাবু ?

কার্তিক তাকে একটা বিড়ি দিয়ে জিজ্ঞাসা কবে তোমাদেব ঝগড়া হচ্ছিল কেন ?

ঝগড়া ? ঝগড়া কেনে হোবে ? পণ্ডিতেব সাথমে কথা বলছি

তুমি পণ্ডিতেব বউ না ?

টিকিন খিলখিলিয়ে হাসে। দেখা যায কার্তিকেব পান বাঙা দাতগুলিব চেয়ে ঢেব বেশি ঘন গাঢ বং টিকিনেব দাঁতে। মিশিতে কুচকুচে কালো হয়ে আছে দাতগুলি। ঠিক যেন সাজানো কালো দুসাবি মুক্তা।

টিকিন টেব পায কার্তিক তাব মুখ দেখবে না দেহেব গড়ন দেখাবে ঠিক কবতে পাবছে না। সে কাছাকাছি চোখেব সামনে এলেই কার্তিক এ বকম কবে, ঠিক যন্ত্রেব মতো বাঁধা নিয়মে খানিক মুখেব দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সবাঙ্গে একবাব চোখ বুলিয়ে নেবে। কিন্তু কাচুমাচু কবে না তাব শান্ত বিষণ্ণ উদাস ভাবটাও ঘোচে না। সে শুধু যেন একটু অবাক হয়ে গেছে। বড়ো ভালো ছোকবা, গাছতলায় বসে তাদেব কাজ দেখে, শেষবেলায় কাজেব শেষে যাব যা পাওনা মিটিয়ে দেয় —বাসভাড়া বিড়ি সিগ্রেট ক্যাশবাবুব সেলামি তাব নিজেব সেলামি এ সব কোনো বাবদে দুটো পয়সাও সে কোনোদিন কাটে না কাবও মজুবি থেকে।

পণ্ডিত ধীবে ধীবে সুব কবে যে পুঁথি পড়ে, সেই পুঁথিতে যে জোয়ানবয়সি ঋষিব ছেলেব কথা আছে কার্তিক যেন চালচলন ভাবেসাবে সেই বকম—শুধু চেহাবা তাব বিচ্ছিবি।

বিড়ি ধবিয়ে টিকিন বলে, বোজ নাই মিলেছে। আজ মিলবে তো ঠিক ?

কার্তিক নোংরা ন্যাকড়ার নস্য দেওয়া নাক ঝেড়ে বলে, আমি কি রোজ দেবার মালিক ? আজ সঙ্গে টাকা দিয়ে দেয়নি, পিয়োন দিয়ে টাকা পাঠিয়ে দেবে বলেছে। টাকা এলে পেয়ে যাবে।

দুরোজ তো পিয়োন না এল ? আজ যদি নাই আসে ? ই কীরকম মজা হল বাবু !

কার্তিক কোনো কথা না বলে শুধু মুখ বাঁকায়। মুখ বাঁকালে মুখটা আরও কুৎসিত দেখায়।

টিকিন গজরগজর করতে করতে ফিরে যায়। জীর্ণ পুরানো যে বাড়িটার পাশে নতুন বাড়িটা উঠছে তার চুনবালি খসা দেওয়ালটার ছায়ায় হাঁটু মুড়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসে আঁচলে বাঁধা শুকনো পান আর তামাক পাতা মুখে ছেড়ে দেয়।

সাদেক হেঁকে বলে, ইটা ল'ও, জলদি—

পণ্ডিত বলে, আরে হেই, মশলা ?

টিকিন হাই তুলে ভগলুকে বলে, পিয়োন রুপেয়া লিয়ে আসবে তবে আজ রোজ মিলবে ভগলু !

সাদেক বলে, রোজ আলবাত মিলেগা। ইটা লাও।

কিন্তু টিকিনের ধাতেব সঙ্গে যেন কাপে মেলানো মরদগুলির ধাত।

পণ্ডিত হাই তুলে বলে, পানি পিয়েগা, পিয়াস জানাতা।

বলে দেড় হাত উঁচু নতুন গাঁথা দেওয়ালের মায়া কাটিয়েই সে টিকিনের পাশে জীর্ণ পুরানো দেয়াল ঘেঁষে বসে চোখ বোজে।

বালতির জলে হাত-পা ধুতে ধুতে ভগলু ভাঙা গলায় গান গেয়ে উঠবার চেষ্টা কবে।

জগদেও বলে, বহুত আচ্ছা ওস্তাদজি !

সমতল চৌকোণ করে সাজানো খোয়ার স্তূপের খানিক তফাতে রতন জগন্নাথ ছোটো খোয়া ভাঙছিল—কাজ যদি ঠিকমতো চলে, দেয়াল গেঁথে উঠে ছাদ গাঁথার প্রযোজন খুব বেশি দূর ভবিষ্যৎ নয়। টিকিন সাদেক পণ্ডিতদের মতো তাদেরও হাত যেন শিথিল হয়ে আসে।

তারাও উঠে গিয়ে বসে পড়ে দেওয়ালের ছায়াতে। ডিবা থেকে বিড়ি বার করে রতন সাদেককে একটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, মেচিস হ্যায় ?

সাদেক দেশলাই জ্বালে। একটা কাঠিতে বিড়ি ধরে পাঁচটা !

খেদের সঙ্গে সাদেক বলে, বড়া লুচ্চা বেইমান বিনোদবাবু। খালি মতলব, খালি মতলব !

তাদের দিকে তাকিয়েই যেন এতক্ষণে কার্তিকের ঘুম পেয়ে যায। মাথার নীচে হাত রেখে সে সটান চিত হয়ে শুয়ে পড়ে !

সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিমে ঢলে পড়ে অনেকটা। আকাশে রুপার চাকতির মতো লেপটে আছে চাঁদ, একটা দিকে একটুখানি কাটা। টিকিন একটা কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বসে মরদগুলিকে।

সূর্য কেবল দিনেব বেলা আকাশের অধিকার পায় চাঁদ কেন রাতেও ওঠে দিনেও ওঠে ?

পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের মতোই ব্যাখ্যা করে বলে, চাঁদ সূরযকা বহু এই সিধা বাত তুম জানতা নেহি ? দিনভর খাটকে রাতমে সূরয নিদ যাতা, রাত ভোর মজা লুটতা মেরে চাঁদ বিবি। দিনমে আকাশ পর উঠকে দেখাতা যে মায় খাঁটি হ্যায় সূরয দেওকা সাচ্চী পত্নী হ্যায়।

টিকিন খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

সেই হাসির সঙ্গে বড়োই বেসুরো বড়োই বেমানান ঠেকে অমলার ধমকের সুরে উদবেগ কাতর প্রশ্ন তোমরা কাজ করছ না কেন ?

টিকিন বলে, দিন মজুরকো রোজ না মিলনেসে কেইস্যা খাটেগা মাইজি ? হাওয়া খায়েগা ?

মাইজি ! অমলা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে টিকিনের দিকে তাকায়। একবারের বেশি দুবার তাকাতে হয় না, দেখলেই টের পাওয়া যায় টিকিনের ছেলেপিলে হবে তিন কী বড়োজোর চার মাসের মধ্যে।

কিন্তু তার তো মোটে তিন মাস অনেক হিসাব করে দেখেছে, তিন মাসের বেশি তার হতেই পারে না—তাকে দেখে কি টের পাওয়া যায় সে ও মা হবে ? নইলে মাইজি বলে কেন !

অমলা তীক্ষ্ণস্বরে ডাকে, কার্তিক !

কার্তিক ধড়মড় করে উঠে আসে।

এদের রোজ দিচ্ছ না কেন ?

ক্যাশবাবু টাকা না দিলে আমি কী করব ? বলেছে পাঠিয়ে দেবে।

অমলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কালকের চেয়ে আজ আরও বেশি শুকনো দেখাচ্ছে তার মুখ। কাল ছিল না, আজ যেন কালিও পড়েছে চোখের কোণে।

এই গরমে পাঞ্জাবির উপর ভাজ করা সাদা চাদর কাঁধে মাঝবয়সি মোটাসোটা ভদ্রলোকটিকে সাথে নিয়ে স্বয়ং বিনোদ গাড়ি নিয়ে হাজির হলে অমলার কালি পড়া চোখে আগুনের ঝিলিক খেলে যায় কিন্তু মুখে কথা সরে না।

এই লোকটিকে কয়েক দিন ধরে বিনোদের কাছে যাতায়াত করতে দেখেছে। আজ ওকে সাথে নিয়ে এখানে আসতে দেখে অমলার বুঝতে বাকি থাকে না।

একটা দাঁও পেয়েছে বিনোদ। তৈরি বাড়ি তার হাতে নেই একটাও, অমলার জন্য এ বাড়িটা তবু খানিকটা তৈরি হয়ে আছে !

তাকে দেখে বিনোদ বিরক্ত হয়ে বলে তুমি এখানে কী করছ ?

অমলা নিশ্বাস ফেলে ঢোক গেলে।

এমনিই এসেছিলাম।

আধঘণ্টা পরে অমলা আর কার্তিক বিনোদের সঙ্গে গাড়িতে [illegible] যায়, চাদর দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ভদ্রলোক তাদের বলে তোমরা বইসা রইছ ক্যান ? কাম কর[illegible] না ?

সাদেক বলে, দু রোজের মজুরি মেলেনি।

ততক্ষণে কোথায় কতদূরে চলে গেছে বিনোদের গাড়ি তবু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে সেইদিকে চেয়ে ভদ্রলোক বলে, হারামজাদা ডাকাইত ! মজুরি পর্যন্ত বাকি থুইছে !

তারপর মুখ ফিরিয়ে আবার চাদর দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ভদ্রলোক বলে, কাম কর, আমি তোমাগো মজুরি দিমু।

পেটের সাত মাসের সন্তানের ভার সামলে উঠতে গিয়ে পণ্ডিতের মুখের দিকে চেয়ে মিশমিশে কালো দাঁত বার করে টিকিন হাসে।

ঠাঁই নাই ঠাঁই চাই

দেবানন্দ প্রথমে তাদের দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে কিছুতেই রাজি হতে চাযনি।

তার নিজের ঘাড়ের বোঝাটাই কম নয়। রোগা দুর্বল স্ত্রী, একটি বিবাহিত ও একটি কুমারী মেয়ে, দুটি অল্পবয়সি ছেলে এবং একটি শিশু নাতি। যে অবস্থায় যেভাবে এদের নিয়ে বিদেশ-যাত্রা, তার ওপর একজন বিধবা ও তার বয়স্কা মেয়েকে সাথে নিতে সত্যই তার সাহস হয়নি।

শোভার মা জোর দিয়ে বলেছিল, আপনার কোনো দায়িত্ব নাই। আমাগো খালি সাথে নিবেন। আমি টিকিট কাটুম, ভিড় ঠেইলা আপনাগো লগে রেল স্টিমারে উঠুম।

তা কী হয় ?

হইব না ক্যান ? আপনারা না গেলে মাইয়াব হাত ধইরা রওনা দিতাম না ?

না, বোঝা হয়ে তাদের ঘাড়ে চাপতে চায না শোভা ও শোভার মা। পথে কোনো সাহায্য বা সহায়তারই দাবি তারা তুলবে না। কথাটা শুধু এই যে, দুটি মেয়েলোক পুরুষ অভিভাবক ছাড়া একলা চলেছে এটা টের পেলেই চোর-ছ্যাঁচড় বজ্জাতরা বড়ো বেশি পিছনে লাগে। দেবানন্দেব সঙ্গে গেলে এই দুর্ভোগ থেকে তারা রেহাই পাবে।

তখন দেবানন্দ তার আসল দুর্ভাবনা ব্যক্ত করেছিল। বলেছিল সাথে নয গেলেন। কলকাত্তা পৌঁছাইয়া কই যাইবেন ? সংবাদ শুনি, শহরের ফুটপাতে তিল ধাবণের ঠাঁই নাই। আমি নিজে কই যামু কী করুম জানি না। আপনারে নিয়া বিপদ বাড়ামু ?

আমাগো ঠাঁই আছে।

শোভার মা নাকি কলকাতায় ছোটোখাটো একখানা বাড়ির অর্ধাংশের মালিক। বাড়িটা হয়েছিল শোভার বাবা আর জ্যাঠামশাই ঘনশ্যামের নামে। দেশের জমিজমা ঘরবাড়ি দেখার জন্য শোভাব বাবা দেশেই থেকেছে বরাবর, জ্যাঠা থেকেছে কলকাতার বাড়িতে। মাঝে মাঝে কয়েক দিনেব জন্য কলকাতা বেড়াতে গিয়ে তারা ও বাড়িতে বাসও করেছে কয়েকবার।

তবে শোভার বাবা মাবা যাওয়ার পর গত ছ-সাতবছব শোভার জ্যাঠাও তাদের খোঁজখবব নেয়নি, তারাও অভিমান করে নিজেদের কোনো খবর দেয়নি শোভার জ্যাঠাকে।

কিন্তু এখন তো আর অভিমান করে বসে থাকার উপায় নেই। বয়স্থা মেয়েকে নিয়ে কলকাতা যেতেই হবে।

ঘনশ্যামকে চিঠি দিয়েছিল। জবাবে ঘনশ্যাম তাদেব যেতে বারণ করেছে। ভয় দেখিয়ে লিখেছে যে, বারণ না শুনে গেলে তারা বিপদে পড়বে। কিন্তু—তা তো আর হয় না। ঘনশ্যাম তাদের খেতে দিক বা না দিক—বাড়িতে মাথা গুঁজতে না দিয়ে তো পারবে না ! পেটের ব্যবস্থা কী হয় না হয় সেটা পরে দেখা যাবে।

দেবানন্দের দুর্ভাবনা ও আপত্তি তখন হ্রাস পেয়েছিল, ওদের যখন মাথা গুঁজবার ঠাঁই আছে, একেবারে একটা বাড়ির অর্ধাংশের মালিকানা-স্বত্বে, তখন আর ওদের সঙ্গে নিতে বিশেষ ভাবনার কী আছে ?

হয়তো ওদের বাড়ির অংশে দু-চারদিনের জন্য তারাও আশ্রয় পেতে পারে।

তাছাড়া শোভার মা তেমন দুর্বলা নয়—শোভাও বুঝি নয়। প্রতিবেশিনী হিসাবে শোভার মা দেবানন্দের সামাজিক অভিভাবকত্ব ঘোষণা করেছে দশজনের কাছে—কিন্তু নিজেও কখনও তার কাছে ঘেঁষেনি বা তাকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। সামাজিক অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শের দরকার হলে

বরাবর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তার কাছারি ঘরে এসেছে, সকালবেলা, সে যখন সরকার গোমস্তা আর পাঁচজন প্রজাকে নিয়ে বিষয়কর্মে ব্যস্ত। ঘোমটা টেনে খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে শোভাকে মাঝখানে মধ্যস্থ রেখে শোভার মা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে।

গোড়ার দিকে বিবেকের উপরোধে মাত্র দু একবার অভিভাবকের দায়িত্ব জাহির করতে বাড়ি বয়ে খবর নিতে গিয়েছিল। শোভা পর্যন্ত সামনে আসেনি। দরজা একটু ফাঁক করে শুধু মুখখানা বার করে বলেছিল, কষ্ট কইরা আপনার আসনের কাম কী? আমাগো দরকার পড়ল আমরা কমু গিয়া।

অত্যন্ত অপমান বোধ হয়েছিল দেবানন্দের।

তোমাগো যাওনের বা কিছু কওনের দরকার নাই।

দরজার ফাকে দেখা গিয়েছিল শোভার মুখ। সে মুখে কথা জুগিয়েছিল কানের পিছনে শোভার মা র মুখ। বোধ হয় দুবার তিনবার শুনবার পর শোভার মুখে মুখস্থ কথা বলেছিল আপনে বোঝেন না। আপনে আইলে লোকে বদনাম দিব।

তাতে আরও অপমান বোধ হয়েছিল দেবানন্দের।

কিন্তু অপমান বোধ বাধা হয়েছিল শ্রদ্ধায় স্বীকৃতি দিয়ে চলিয়ে যেতে। শোভার এক মামা এসে হয়েছিল হাজির। বোনের এবং ভাগনির অভিভাবক হবে জমিজমা ঘর পুকুরের মালিক হবে।

দেবানন্দের কাছারি ঘরে একটা সামাজিক ব্যাপারের ছুতায় রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য জনদশেক স্থানীয় বিশিষ্ট লোক জমায়েত হয়েছিল—মেয়েকে সামনে ধরে শোভার মা সেইখানে হাজির।

শোভার মুখ দিয়ে নয়, শোভাকে সামনে রেখে নিজের মুখে স্পষ্টভাষায় জানিয়েছিল যে সে বিপদের প্রতিকার চাইতে এসেছে। দেবানন্দকে বাপ ধরে নিয়ে সে পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই মেয়েকে মানুষ করছে, সব কাজ কারবার দেখাশোনা বিলি ব্যবস্থা করে আসছে। হঠাৎ একজন আত্মীয়তার অজুহাতে এসে তার ঘর দুয়ার দখল করে তাদের পথে বসাবার চেষ্টা করবে, এটা সে বরদাস্ত করবে না।

একজন বলেছিল, কেডা আইছে গো—গোবর্ধন? সে না শোভার মামা?

বুড়ো হরিনারায়ণ চমকে উঠে বলেছিল, মায়ের পেটের ভাই না তোমার?

ভাই? একযুগ বইনের খবর নেয় নাই সে ও ভাই? চোরডাকাতে রাতে সিঁদ কাটে, হানা দেয়। বইনের কেউ নাই জাইনা দিনদুপুরে দশজনেরে জানান দিয়া ভাই হইয়া বইনের সব লুটবার আইছে। সে ও ভাই? ভাই দিয়া আমার কাম নাই মাইয়ার কাম নাই মামা দিয়া। যাইতে কই যায় না। আপনারা বিহিত করেন।

বিহিত তাদের করতে হয়েছিল শোভার মামাকে ভাগিয়ে দিয়ে। দেবানন্দ টের পেয়েছিল, শোভার মা র বুকের পাটা শক্তই আছে।

শিয়ালদহ নেমে চারিদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ তারা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিবরণ আগেই শুনেছিল, কিন্তু এত মানুষ এইটুকু জায়গায় এভাবে গাদাগাদি করে দিনরাত কাটাতে পারে চোখে দেখার আগে এটা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। মনে হয়, ক টা পিঁজরাপোলীয় হাসপাতাল যেন গড়ে তুলেছে জগতের পরিত্যক্ত মানুষ-- কচিশিশু থেকে শেষ বয়সের মেয়েপুরুষ।

পৃথিবীতে এত অনটন ঘটেছে স্থানের?

শোভার মা বলে, বাবা, আপনারা কই গিয়া উঠবেন?

দেবানন্দ বলে, তোমাগো আগে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি –ফিরা আইসা ঠাঁই খোঁজনের চেষ্টা করুম।

মনুষ্যত্বের এই পিঁজরাপোলে সকলকে বসিয়ে রেখে দেবানন্দ তাদের পৌঁছে দিতে যাবে—এই সহজ কথাটা যেন শোভার মা বুঝতে পারে না। সে একটু ব্যাকুল দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে দেবানন্দের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। পথের বাস্তবটা ঘণ্টাকয়েক সময়ের মধ্যেই দেবানন্দের কাছে তার বহু যুগের ঘোমটার আড়াল প্রায় ঘুচিয়ে দিয়েছে।

শোভা বলে, মা ? আমরা দুইখান ঘর পামু না ?

শোভার মা চিন্তিত মুখে বলে, সেই কথাই তো ভাবি। দুইখান ক্যান, একখান ঘর পামু সঠিক জাইনা কী চুপ কইরা আছিস ভাবস ? যে চিঠি লিখছে তোর জ্যাঠা—

শোভা বলে, দিব না কও ? আমাদের ভাগের ঘর দিব না ক্যান ? জোর কইরা দখল করুম।

শোভার ছেলেমানুষি তেজে যেন তার মার সম্বিত ফিরে আসে। তার মফস্বলের তেজ ও দৃঢ়তা অনভ্যস্ত অচিন্তিত অবস্থায় এসে পড়ে খানিকটা ঝিমিয়ে গিয়েছিল। সে আর দ্বিধা করে না, দেবানন্দকে বলে, আপনারাও আসেন আমাগো লগে। যে কয়দিন বাসা খুইজা না পান, মাথা গুইজা থাকবেন।

তা কি হয় ?

হয়। মা-বইন বাপ-ভাই আপনাগো ফেইলা আমি গিয়া ঘরে উঠুম ? আমি আপনার অমন মাইয়া না।

দেবানন্দের বড়োমেয়ে মায়া ছলছল চোখে চেয়ে বলে, বাবা আবার তোমারে সঙ্গে নিতে ডরাইছিল !

তার ছোটোবোন ছায়া শোভার দিকে চেয়ে একটু হাসে। আগে তাদের জানাশোনা ছিল, পথের কষ্টকর গা-ঘেঁষাঘেঁষি ঘনিষ্ঠতায় তারা সখীতে পরিণত হয়ে গেছে।

শোভার মা বলে, আমি তো ডরাই। ভাসুর যা চিঠি লিখছে—রওনা দিতে বারণ কইবা। বিষম নাকি বিপদ হইব। তা মরার বাড়া বিপদ কী ?

দেবানন্দ বলে, তোমরা আইসা ভাগ বসাইবা তাই বারণ করছে। ভয় দেখাইয়া যদি ঠেকান যায়।

শোভার মা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে : চিঠির ধরণ তেমন না। ওই কুমতলব থাকলে বানাইয়া দশটা অজুহাত দিত, লিখত যে এই এই ব্যাপার হইছে কাজেই তোমরা আইসো না। কোনো কারণ না, কেমন যেন দিশাহারাভাবে লিখছে চিঠিখান। মনে লাগে, কিছু ঘটছে।

একটা গাড়ি ভাড়া করে তারা রওনা দেয়।

বাড়িটা শহরের এক ঘিঞ্জি নোংরা প্রান্তে।

কলকাতায় বাড়ি করার আসল দরকারটা ছিল ঘনশ্যামেরই, শহরেই তার স্থায়ী বসবাস। একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ভাগাভাগিতে বাড়ি করার প্রস্তাব সে-ই করেছিল শোভার বাবার কাছে—ওরা দেশেই থাকবে বরাবর, মাঝে মাঝে কেবল কিছুদিনের জন্য বেড়াতে আসবে, বাড়িটা এক রকম সে-ই সপরিবারে ভোগ-দখল করবে।

সমস্ত নগদ সঞ্চয় দিয়ে এবং জমি বেচে শোভার বাবা নিজের ভাগের টাকা দিয়েছিল, কলকাতা শহরে একটা বাড়ির অংশ থাকবে শুধু এইটুকুর জন্য।

আর আজ বিপদে পড়ে সেই ভাইয়ের বউ আর মেয়ে কলকাতা আসতে চাইলে ঘনশ্যাম বিপদের ভয় দেখিয়ে তাদের আসতে নিষেধ করে।

গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকবে না। গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেবানন্দ আর শোভার মা গলিতে ঢোকে।

ছোটো দোতলা বাড়িটার সদরের কড়া নাড়তে অল্পবয়সি কালো একটি ছেলে দরজা খোলে। —শোভার মা-র সে অচেনা !

কাকে চান ?

দেবানন্দ বলে, ঘনশ্যামবাবুরে ডাইকা দাও।

ছেলেটি বলে, ঘনশ্যামবাবু ? তিনি তো এখানে থাকেন না।

শোভার মা বলে, কী কথা কও থাকেন না ? তার বাড়ি না এটা ? ছেলেটি মাথা নেড়ে বলে, না। এটা আমাদের বাড়ি, কিনে নিয়েছি। দেবানন্দ আর শোভার মা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

কতদিন কিনা নিছ ?

আর বছর।

শোভার মা হতভম্ব হয়ে থাকে। দেবানন্দ হিসাবি-বিষয়ী মানুষ, এইটুকু ছেলের সঙ্গে আলাপ করে লাভ নেই বুঝে বলে, খোকা তোমার বাবারে ডাইকা দিবা ?

আমার বাবা নেই। এটা মামার বাড়ি।

মামা বাড়ি আছেন ? ওনারেই ডাইকা দাও।

খানিক পরে ভুঁড়িওলা প্রৌঢ়বয়সি কৃষ্ণদাস বাইরে এলে দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করে, আপনে এই বাড়ি কিনছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা কী চান ?

আমি ঘনশ্যামবাবুর দ্যাশের লোক। ইনি তার ভায়ের বউ।

কৃষ্ণদাস বলে, তা আপনারাই আসবেন জানিয়ে কার্ড লিখেছিলেন ? চিঠিটা আমি তো সঙ্গে সঙ্গে ঘনশ্যামবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি ! উনি আপনাদেব ঠিকানা জানাননি ?

দুজনেই তারা স্বস্তি বোধ করে। বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে থাক, ঘনশ্যামেব পাত্তা অন্তত পাওয়া যাবে !

দেবানন্দ বলে, চিঠি লিখেছেন কিন্তু ঠিকানা দিতে ভুলে গেছেন।

প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে হাই তুলে কৃষ্ণদাস বলে ভুলে হয়তো জানেনি, ইচ্ছা করেই ঠিকানা জানাননি। মানুষটার বড়ো দুরবস্থা।

ঘনশ্যামের দুরবস্থার বিবরণ শুনতে শুনতে দেবানন্দ ও শোভার মা আবাব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

কাজ নেই। রোজগার নেই। বোগে ভুগছে। দেনায় বিকিয়ে গেছে এই বাড়ি। ঘনশ্যামকেও উদ্‌বাস্তু হতে হয়েছে। ওইখানে উঠে গেছেন--হাত বাড়িয়ে আঙুলের সংকেতে কৃষ্ণদাস গলির আরও ভিতরের দিকে বাঁকের ও পাশে খোলার চালাগুলি দেখিয়ে দেয়। দুটো পাকা বাড়ির ফাঁকে দু-তিনটে খোলার চালাই শুধু দেখা যাচ্ছিল।

শোভার মা সেদিকে পা বাড়াতেই দেবানন্দ বলে, রও, রও। গাড়িটারে ছাইড়া দিয়া আসি। বেশি দেরি হইলে ব্যাটা তিনগুণ ভাড়া আদায় করব।

রাস্তার শুধু একদিকে দু-হাত চওড়া ফুটপাত, তার গা ঘেঁষে উপরে মাথা তুলেছে শীর্ণ রুগ্‌ণা অজানা গাছটা।

ওই গাছের তলে ফুটপাতে জিনিসপত্র নামিয়ে সকলকে বসিয়ে গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে দেবানন্দ আর শোভার মা আবার গলিতে ঢোকে।

খোলার বাড়ি খোলার ঘর হলেই নোংরা হয় না। খোলার ঘরের গরিব বাসিন্দারাও ঝাঁট দিয়ে লেপে পুঁছে ঘর-দুয়ার সাফ রাখতে জানে—এ রকম সাফ রাখাটা প্রায় শুচিবাইয়ের পর্যায়ে উঠে যায়। কিন্তু খোলার ঘরের সামান্য আশ্রয়েও এমন গিজগিজে ভিড় জমেছে মানুষের যে সাফসুরুত রাখার চেষ্টা অসম্ভব হয়ে গেছে।

মানুষ জাতীয় জীবের খাটালে পরিণত হয়েছে বাড়িগুলি।

দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসবে, আজও যাদের অন্নপ্রাশন হয়।

দুজনের কোনোরকমে থাকবার মতো আঁধারে একটা স্যাঁতসেঁতে ঘর।

সেই ঘরে ঠাঁই জুটেছে ঘনশ্যামের পরিবারের ছোটোবড়ো মোট আটজন মানুষের। এক কোণে ঘনশ্যাম পড়েছিল চাদর মুড়ি দিয়ে। ঘনশ্যাম অথবা তার কঙ্কাল চেনাই মুশকিল।

শোভার মা-কে দেখে ঘনশ্যাম কাতরাতে কাতরাতে বলে, বারণ করলাম, তবু আইলা ? এখন সামলাও।

দুজনকে বসতে দেওয়া হয় দুটুকরো তক্তায়। বোঝা যায়, তক্তার টুকরো দুটো সংগ্রহ করে আনা—ছেলেমেয়েদের দ্বারা। কাছেই কোথাও কংক্রিটের গাঁথনি উঠছে বোধ হয়।

আমাগো যে জানান নাই ?

জানাব ভাবছিলাম। তোমাগো কী অবস্থা কে জানে। তাবপর চিঠি পাইলাম, বারণ কইরা লিখলাম আইসো না। এখন মজা বোঝ।

শোভার মা মফস্বলের তেজে ফোঁস করে ওঠে, মজা কীসের ? এত বড়ো পৃথিবীতে মাথা গোঁজনের ঠাঁই পামু না ? ঠাঁই আদায় কইরা নিমু।

চুরি চামারি

লোকেশ মাইনে পেল চার তারিখে। রাত্রে তার ঘরে চুরি হয়ে গেল।

সেদিনও আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে লোকেশের রাত ন টা বেজে গিয়েছে। কোথাও আড্ডা দিতে সিনেমা দেখতে বা নিজের জরুরি কাজ সারতে গিয়ে নয়, সোজা আপিস থেকে বাড়ি ফিরতেই দেরি।

ছোটো বেসরকারি আপিস— যদিও আধা সরকারিভাবে সরকারের সঙ্গে যোগ আছে। লোক খাটে কম—যত লোকের খাটা দরকার তার চেয়েও কম।

এমনিতেই দু একঘণ্টা বেশি খাটিয়ে নেয় ওভারটাইম না দিয়েই, মাসকাবারে ক দিন আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত আপিসে থাকতে হয়। খুব সোজা কৌশল, বেতন দেবার সুনিশ্চিত আশ্বাস দিয়েও সময়মতো বেতন না দিয়ে আটকে রেখে খাটিয়ে নেওয়া।

এবং এমনই তাদের প্রচণ্ড প্রয়োজন মাসকাবারি বেতনটার যে আশায় আশায় রাত আটটা নটা পর্যন্ত কাজ করে যায়।

মাইনে অঘোর দেবে, না দিয়ে উপায় নেই। আজ দিয়েও তো দিতে পারে ?

অঘোর বলে, বসে থাকবেন না, বসে থাকবেন না। মাইনে পান খেটে খান—এ ভাবটা ভুলতে চেষ্টা করুন। ও রকম ভাবলে কারখানার কুলিরা। মনে রাখবেন, বড়ো মন্দার বাজার। আপিস টিকে থাকলে তবেই আপনারা টিকে রইলেন আপিসের উন্নতি হলে তবেই আপনাদের উন্নতি।

তারা গুজগাজ ফোঁসফাঁস করে। চাপা গলায় কেউ গর্জে ওঠে, দুত্তেরি তোর—

ক্ষোভ বুকে নিয়ে তবু কাজ করে যায়। কৌশলটা খাটছে না দেখলে অঘোর হয়তো চটে গিয়ে আরও বেতন গোনা একদিন পিছিয়ে দেবে শোধ নিতে।

কদাচিৎ পয়লা দোসরা তারিখেও বেতন মিটিয়ে দেয়। যে তারিখেই মাইনে পাক তারা সই করে পয়লা তারিখে পেয়েছে বলে।

উদবেগ চেপে রেখে ছবি প্রশ্ন করে পেয়েছ আজ ?

পেয়েছি।

নোট ক টা ছবির হাতে দিয়ে সে জামাকাপড় ছাড়তে থাকে।

মুখ-হাত ধোয়া হতে না হতে ঘরের বাইরে বাড়িওলা সুরেনের গলা শোনা যায়— আছেন নাকি লোকেশবাবু ?

লোকেশ ঘরের ভেতর থেকেই বলে, আছি মশায়, আছি। এত অস্থির হন কেন ? সারাদিন খেটেখুটে এলাম, সকালে দিলে হত না ?

দেয়াটা দিলেই চুকে যায়।

ছবি বলে, দিয়ে দাও চুকে যাক।

সুরেনকে ঘরখানার ভাড়া দিয়ে রশিদ নিয়ে খেতে বসে ক্ষুব্ধ লোকেশ বলে, কই আমরা তো পাওনা টাকা এভাবে আদায় করতে পারি না ? প্রত্যেক মাসে মাইনে দিতে টান বাহানা করবে, বেশি বেশি খাটিয়ে নেবে।

খাটেন কেন ? জোর করে বলতে পারেন না পয়লা তারিখে মাইনে চাই, বেশিক্ষণ খাটালে পয়সা চাই ?

বুটি চিবোতে চিবোতে লোকেশ একটু ঝাঁঝালো হাসি হেসে বলে, আপনি কী বুঝবেন বলুন ? কম লোক, ইউনিয়ন-ফিউনিয়ন নেই, যে তেড়িবেড়ি করবে তাকে দেবে খেদিয়ে। আমরা কী বলাবলি করি না ভেবেছেন যে এ সব অন্যায় আর সইব না ? কিন্তু ওই বলাবলিই সার হয়। একজনকে এগিয়ে হাল ধরতে হবে তো ? যে এগোবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বরখাস্ত করবে। ব্যাটা এক নম্বর চামার।

ছবি গোমড়া মুখে বলে, সত্যি। যা দিনকাল, এর মধ্যে চাকরি-বাকরি চলে গেলে—

সে যেন শিউরে ওঠে।

রাত্রে দুজনেই তারা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়। কাল দোকানের ধার দুধের দাম এ সব মিটিয়ে দেওয়া যাবে। রেশন আসবে, অনেকদিন পরে আধপো মাছ এনে স্বাদে গন্ধে ভাত খাবে। ছবির জন্য শাড়ি একখানা চোখ-কান বুজে কিনে ফেলা হবে কি না সেটাও ঠিক করে ফেলা যাবে।

ঘুমের মধ্যে রাত্রে চুরি হয়ে যায়।

তারা টেরও পায় না।

ভোরে অন্য লোকের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে দ্যাখে এই ব্যাপার !

পাড়াতেই দু-তিন ঘরে চুরি হয়ে গেছে কিছুদিনের মধ্যে, তাদেব ঘবে চুরি হওয়াটা মোটেই আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কিন্তু জানালার বাঁকানো শিক, খোলা দরজা আর তাদের যথাসর্বস্বেব শূন্যস্থান দেখেও যেন তাদের বিশ্বাস হতে চায় না যে সত্যসত্যই তাদের ঘরে চুরি হয়ে গেছে।

কেবল দুটি মানুষ বলেই সামান্য মাইনেতে তাদের একখানা ভাড়াটে ঘরে মুখ গুঁজে কোনোরকমে চলে যায়, তাদের ঘরে চুরি ! পাড়াতেই তো কত পয়সাওলা লোক আছে, এ বাড়ির দোতলাতেই বাস করে বাড়িওলা সুরেন—ওদের বাদ দিয়ে তাদের ঘরে হানা দেবার জন্য এত হাঙ্গামা করার তো কোনো মানেই হয় না !

তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

লোক জড়ো হয়েছে, জিজ্ঞাসা মন্তব্য আর এখন তাদের কী করা কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া চলছে, নিঃশব্দে তলার কাঠ কেটে চোরেরা কী করে এত মোটা শিক বাঁকিয়ে দিল তাই নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ ও জল্পনা-কল্পনা চলছে—কিন্তু লোকেশ আর ছবির কাছে কিছুতেই যেন ঠিকমতো গুরুতর হয়ে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা।

সুরেন বলে, দেখলেন তো মশায় ? ভাগ্যে ভাড়াটা আদায় কবে নিয়ে গেছলাম, নইলে ওই টাকাটাও গচ্ছা যেত আপনার।

শুনে লোকেশের যেন হাসিই পায়।

যার এক রকম সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে, ভাড়ার ওই ক-টা টাকা বেঁচে গেছে বলে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা !

এই কথাটা উল্লেখ করে ছবিও পরে বলেছিল, আমার কানপাশা যে বাঁধা দিয়েছিলে সেটাও তাহলে আমাদের ভাগ্যি বলতে হবে !

ঘরে ছিল একটি ট্রাংক, একটি চামড়ার সুটকেস একটি হাতবাক্সো, তাকে সাজানো কিছু বাড়তি বাসন আর আলনায় সাজানো জামাকাপড়। এ সব কিছুই চোরেরা রেখে যায়নি !

নিত্য ব্যবহারের অর্থাৎ গায়ের গহনা আর রান্না-খাওয়ার বাসনগুলি আছে। আটগাছা চুড়ির মধ্যে চারগাছা আছে, হাতে, গলায় হারটা আছে আর কানে দুল। অন্য ভাড়াটের সঙ্গে সিঁড়ির নীচেকার ছোট্ট ঘরটিতে তাদের রান্না হয়, ও ঘরে থাকায় মাজা-বাসন ক-টা রয়ে গেছে।

আর সমস্ত কিছুই চোবে নিয়েছে। সোনা রুপার গয়না ও উপহার দ্রব্য, বিয়েতে এবং অন্যভাবে পাওয়া সমস্ত দামি জামাকাপড়— সাধারণ ভালো জামাকাপড় ক-টা পর্যন্ত !

আলনাটা পর্যন্ত খালি করে নিয়ে গেছে ?

এটাই যেন সকালে তাদের পীড়ন করে সব চেয়ে বেশি !

পরনের লুঙ্গি আর একটা ছেঁড়া পাঞ্জাবি ছাড়া কিছুই নেই লোকেশের যে পরে আপিস যাবে !

লুঙ্গি আর ছেঁড়া পাঞ্জাবিটা পরে বেরিয়ে রাস্তায় যে জামাকাপড় কিনে নেবে তারও উপায় নেই, সারা ঘর হাঁতড়ে বেড়ালে দুটো তামার পয়সা মিলবে কিনা সন্দেহ !

পয়সাকড়ি সব ওই হাতবাক্সোটায় থাকত।

তারপব আছে পেটের ব্যাপার। রেশন আনলে, বাজার করলে তবে খাওয়া জুটবে !

ছবিব মুখে সত্যই একঝলক হাসি ফোটে। চোবেবা যেন তাদেব জন্য একটা ভারী মজার অবস্থার সৃষ্টি করে গেছে।

খাওয়া তো পরের কথা। একদানা চিনি নেই যে তোমায় এক কাপ চা করে দেব !

এতক্ষণ বড়োই চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল লোকেশের মুখ, ছবির কথা বলার ভঙ্গিতে তার মুখেও হাসি ফোটে।

ক-টা ঢাকা ধারের চেষ্টা দেখি। তারপর যা হয় হবে।

ছবির মুখের ভাব শক্ত হয়ে যায়।

কার কাছে ধাব চাইবে ? সেদিন যারা দশটা টাকা দিল না, কানপাশা দুটো বাঁধা দিতে হল, আবার তাদের কাছে হাত পাততে যাবে ?

লোকেশ বলে, তা নয়, তখন মাসের শেষ, কারও হাতে সামান্য টাকাও ছিল না। নইলে কী রমেশবাবু, তিলকবাবু ক-দিনের জন্যে দশটা টাকা দিত না ? এমন বিপদ ঘটল, আজ যার কাছে চাইব সে ই দেবে।

ছবি ধীবে ধীরে মাথা নাড়ে।

ক-দিনের জন্য তো ধার নেবে, ক-দিন বাদে শোধ দেবে কোত্থেকে ? সারা মাস চালাবে কী দিয়ে ?

লোকেশ গোমড়া মুখে বলে, সে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। উপায় কী ?

থাক, তোমাব আর আবোল-তাবোল ব্যবস্থা করে কাজ নেই। আমি ব্যবস্থা করছি—

বেশ খানিকটা মরিয়া বেপরোয়া মনে হয় ছবিকে। চোরেরা যেন ঘব খালি করে নিয়ে যাবার সঙ্গে তার মনেব ভয়-ভাবনাগুলিও চুরি করে নিয়ে গেছে।

আজ আপিস না গেলে হয় না ?

মাইনে পেয়েই কামাই করাটা...

সমস্ত সমস্যা যেন মীমাংসা কবে ফেলেছে এমনইভাবে ছবি বলে, তাহলে এক কাজ করো। বেলা হয়ে গেছে, রেশন এনে সাড়ে আটটায় খেয়ে বেরোতে পারবে না। দোকানে চা খেয়ে ওই বুড়ির কাছ থেকে আধসের চাল আর দোকানে ডিম-টিম যা পার এনে দাও—

এবার লোকেশ চটে যায়।

চা খেতে, চাল ডিম আনতে পয়সা লাগবে না ?

পয়সা আমি দিচ্ছি !

বিয়ের কমদামি খাটের বিছানার তলায় ডান হাতটা প্রায় সমস্তখানি ঢুকিয়ে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে ছবি বার করে আনে আস্ত একটা পাঁচ টাকার নোট !

বলে, ছ-সাতমাস আগে পাঁচ টাকা হিসেবে মেলেনি মনে আছে ? হারিয়ে যায়নি, আমি চুরি করেছিলাম।

তারপর একটু উদ্‌বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, চলবে তো ? দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

লোকেশ বলে, চলবে। একশোবার চলবে। তোমার জন্য চা আনব না ?

আমি মনোদির সাথে খাবখন। এমন বিপদে পড়েও টাকা চালডাল ধার চাইছি না—এতখানি দয়ার বদলে এক কাপ চা না খাওয়ালে চলবে কেন।

লোকেশ তবু ইতস্তত করে।

ছবি তাগিদ নিয়ে বলে, দাঁড়িয়ে রইলে যে ? বেলা বাড়ছে না ?

সব তো বুঝলাম। আমি আপিস যাব কী পরে ?

সে ব্যবস্থা করছি। শুধু চা খাব না, মনোদির কাছে রবীনবাবুর একখানা ধুতি ধার করব। পরশু তরশু লন্ড্রিতে আর্জেন্ট ধুইয়ে ফেরত দিলেই চলবে।

লোকেশ তবু ইতস্তত করে। সে তো বুঝলাম। কিন্তু তারপর কী করব ?

ওর জবাব সেই এককথা। কী আবার করবে, আপিস যাবার সময় নিয়ে যাবে।

লোকেশদের আপিসে সেদিন কাজে বড়োই ব্যাঘাত ঘটে। কাজ আরম্ভই হয় ঘণ্টাখানেক দেরিতে।

সবাই এসে পৌঁছে গেলে লোকেশ সকলকে বলে, টুল-ফুল নিয়ে সবাই জড়ো হয়ে বসুন দিকি একসাথে। ভীষণ জরুরি কথা আছে।

তার মুখ দেখে আর কথা শুনে সবাই একটু হকচকিয়ে যায় বটে কিন্তু তাকে ঘিরে বসে সকলেই।

কোনো রকম ভূমিকা না করে লোকেশ জোরের সঙ্গে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, আমরা কী কুকুর বিড়াল, যত ইচ্ছা খাটিয়ে নেবে, সকাল ন-টায় শুরু করিয়ে রাত ন-টায় ছুটি দেবে ? সময়মতো মাইনে দেবে না ?

একজন বলতে যায়, তোমার বাড়িতে নাকি চুরি হয়েছে শুনলাম ?

লোকেশ বলে, ঘর খালি করে সব নিয়ে গেছে।

সে গল্প পরে বলছি। এখন কাজের কথা শুনুন। আমরা চুপচাপ মেনে নিই বলে আরও পেয়ে বসেছে ! আজ আমরা সাফ জানিয়ে দেব যে আমরা আপিস আইনের বাঁধা-টাইমের বেশি খাটব না, খাটালে ওভারটাইম দিতে হবে। ঠিক তারিখে মাইনে দিতে হবে আমাদের।

সকলে নির্বাক হয়ে থাকে।

লোকেশ শান্তভাবেই বলে, ভয় পাবেন না। যা বলার আমিই বলব অঘোরবাবুকে, আমিই সকলের হয়ে ঝগড়া করব। আপনারা শুধু আমার পিছনে থাকবেন। যদি ক্ষতি করে আমার করবে, আপনাদের কিছু করবে না।

তবে বাড়ির চুরির ব্যাপারটা জানতে চেয়েছিল প্রৌঢ়বয়সি যতীন। সে সঙ্গে সঙ্গে জোর দিয়ে বলে তোমার একলার ক্ষতি করবে মানে ? আমরা তা মানব কেন ?

এক ঘণ্টা আলোচনার পর যে যার জায়গায় গিয়ে বসে। কিন্তু কাজে কারও মন বসে না। অঘোর আরও দেরিতে আসবে, কিন্তু খবর তার কানে পৌঁছুবে। নিশ্চয় ডেকে পাঠাবে লোকেশকে।

তারপর কী নাটক আরম্ভ হবে কে জানে ছা-পোষা চাকরি-সর্বস্ব তাদের আপিস-জীবনে ?

অঘোর যথাসময়ে আসে। নিজের ঘরে বসে। কাজ করার বদলে সকলে এক ঘণ্টা জটলা করেছে, খাস ও একমাত্র বেয়ারা বেচুর কাছে এ খবরও নিশ্চয় সে শোনে। কিন্তু সারাদিন কেটে যায়, লোকেশকে সে ডাকে না।

আপিসের মুষ্টিমেয় মানুষ ক-টার বিদ্রোহের খবর যে সে পেয়েছে সেটা টের পাওয়া যায় একটিবারও তার আপিস ঘরে না আসায়। রোজ সে তিন-চারবার টহল দিয়ে যায়।

ক্রমে ক্রমে সকলে এটাও টের পায় যে অঘোর প্রতীক্ষা করছে। তারা নিজে থেকে কী করে না দেখে সে কিছুই করবে না !

পাঁচটা বাজতেই সকলে কাজ বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। লোকেশ বেচুকে ডেকে বলে, বল গে যাও, আমবা যাচ্ছি !

মিনিট পাঁচেক পবে অঘোর নিজেব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শান্ত কিন্তু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা কবে, কী ব্যাপার ?

অবুঝ ছেলেরা দুষ্টামি করে বাযনা ধবেছে। সে পিতার মতো শুনতে চায় তাদের নালিশ ! শুনে নিশ্চয় স্নেহময় কিন্তু তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক পিতার মতোই বিচার করবে।

লোকেশও শান্ত গম্ভীরভাবে তাদের নালিশ জানায়, তাবা অতঃপর কী করবে স্থির করেছে তাও জানায।

অঘোর উদাস-উদাবভাবে বলে, বেশ তো। তোমরা চাকবি করার সরকারি আইনমতো চাকরি করতে চাইলে আমি কি না বলতে পারি ? আমি কি আইন ভেঙে গায়ের জোরে তোমাদের বেশি খাটিযেছি ? ও সব আইন-টাইনের কথা খেয়ালও ছিল না আমাব। আমরা মিলেমিশে কাজ করছি, মানিয়ে চলছি, ব্যাস।

লোকেশের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ বেখে বলে, তোমরা যে ঘবোয়া ব্যবস্থাটা পছন্দ করছ না আমাকে জানালেই হত। হঠাৎ এ বকম গন্ডগোল করাব কোনো মানে হয ?

নিজেব আপিসেব উপরেই যেন বিতৃষ্ণা এসেছে এমনিভাবে নাক-মুখ সিঁটকোতে সিঁটকোতে অঘোর সকলের আগে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠে।

একটা মস্ত যুদ্ধে যেন জয়লাভ করেছে, প্রকাণ্ড অনিয়ম থেকে বেহাই পেয়েছে, এমনইভাবেই সকলে কলবব করে, সমবয়সি দু-একজন পিঠ চাপড়ে দেয় লোকেশেব।

প্রৌঢ় যতীন বলে, আজকেই শেষ হয়ে গেল ভাবছ নাকি তোমরা ? আমরা গুটিসুটি মেরে পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম, লোকেশ বেচারা এগিয়ে গিয়ে ঝগড়া করল—ব্যাস অমনি সব ঠিক হযে গেল। বেকাযদায় পড়ে মেনে নিয়েছে তাই। শোধ না তুলে ছাড়বে ভেবেছ ?

সবাই চিন্তিত হয়ে বাড়ি ফেরে।

গতরাত্রে চুবি হযে গেছে—গযনাগাঁটি মালপত্র। আজ ভোবরাত্রেও যে চোব আসবে কে তা জানত !

ছবির আব সব গেছে। অল্পদামি বিয়ের খাটে লোকেশের পাশে শুয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমানোর অধিকারটা বজায় ছিল।

শেষরাত্রে প্রকাশ্যভাবে ভ্যান চালিয়ে চোর এসে তার বাহুবন্ধন থেকে চুরি করে নিয়ে যায় লোকেশকে। আটক আইনের জোরে।

দায়িক

অলুক্ষুনে সন্তান ?

নইলে প্রায় এগারোটি মাস মায়ের পেট দখল করে থেকে এমন অসময়ে ভূমিষ্ঠ হয়, অসময়েব এই বাদলা আর হাড়-কাঁপানি শীত শুরু হবার পর ?

মেয়েটাকে মারবার জন্যই কি দেবতাদের ইঙ্গিতে প্রকৃতির এই নিয়মভাঙা খাপছাড়া আচরণ ?

কে জানে !

একটা ছেলেকে মারবার জন্য দেবতারা ব্যস্ত হয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটাবে, এটা ভাবতেও আবার মনটা খুঁতখুঁত করে গোবিন্দের।

কেন তবে তার প্রথম সন্তানের নিশ্চিত মরণ এভাবে ঘনিয়ে আসবে ?

ক্রমে ক্রমে শীতের এখন বিদায় নেবার পালা। এলোমেলো উলটো-পালটা বাতাস বইবে কখনও উত্তর কখনও দক্ষিণ থেকে, রাতে কাঁথাকাপড় দরকার হলেও দিনের বেলায় ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব খালি-গা জুড়িয়ে দেবে। তার বদলে বলা নেই কওয়া নেই শুরু হয়েছে টিপটিপ বৃষ্টির সঙ্গে কনকনে উত্তুরে হাওয়া !

কী দাপট শীতের।

হোগলার একরত্তি আঁতুড়ঘর। গোয়ালের পাশে ছিটালের গা ঘেঁষে তোলা। ভিতের লেপা-পোঁছার বালাই নেই, মানুষের জন্মলাভের মতো নোংরা অস্থায়ী ব্যাপারটার জন্য অত হাঙ্গামা কে করে ? মাটিটা শুধু একটু চেঁছে দেওয়া হয়েছে কোদাল দিয়ে।

সস্তা পুরানো হোগলার চালাটা তুলে ভিতরে দুটি খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। খড়ের উপর বস্তা-কাটা পুরানো ছেঁড়া একটা চট।

মোটে একটা মাসের ব্যাপার। মাস কাটলেই আঁতুড় উঠবে, স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ছেলে নিয়ে রেবতী ঘরে উঠতে পাবে। তখন ফেলে দেওয়া হবে হোগলার চালা।

চিরকালের এই রীতি।

তার বাপদাদারাও এমনি চালার ঘরে জন্মেছে, তার নিজের বেলাও অন্য কোনো ব্যবস্থা হয়নি।

অনেক পুরুষ ধরে অনেকে যেমন জন্মেছে তেমনই অনেকে অবশ্য মরেও গেছে এই আঁতুড়ে।

তা তো মরবেই। জন্ম আর মৃত্যু নিয়ে সংসার—শুধু জন্ম নিয়ে তো নয়।

মেয়েটা বাঁচবে আশা করতে ভরসা হয় না। রেবতীও বাঁচবে কি না সন্দেহ। বাদলা ধরার বা শীত কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বেড়ার চারিদিকে মাটির আল তুলে দিয়ে গোবিন্দ ভিতরে জল গড়িয়ে যাওয়া ঠেকিয়েছে, কিন্তু হোগলার ফাঁক দিয়ে জলের ছাঁট যাওয়া বন্ধ করা যায়নি।

দাওয়ায় বসে গোবিন্দ আকাশ-পাতাল ভাবে, রেবতীর ক্ষীণকণ্ঠ কানে এলেও কিছুক্ষণ সাড়া দেয় না। তারপর ধীরে ধীরে উঠে মানপাতাটা তুলে মাথায় দিয়ে আঁতুড়ের কাছে যায়। আঁতুড়ের হোগলার উপরে চাপাবার জন্যই সে কয়েকটা মানপাতা কেটে এনেছিল।

রেবতী শীতে কাঁপছিল কিন্তু কথা বলতে গিয়ে গলা তার কেঁপে যায়। ভয়েই বলে, সেঁক তো দিলাম, আওয়াজ দিচ্ছে না যে ? আরেকটু আগুন করে দাও।

দিচ্ছি।

সে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ দুদিনের বাচ্চাটার দিকে চেয়ে থাকে। শরীরটা কাথায় ঢাকা, মুখটা শুধু দেখা যায়। শ্যামবর্ণ শিশুর মুখের চামড়াটা যেন খানিকটা নীল হয়ে কালচে মেরে গেছে মনে হয়।

বেরতী ক্ষীণগলায় আবার বলে, ছাট লেগে ভিজে যাচ্ছি। হাড়ের তেজ নেই ? ভেতর থেকে কাঁপছে। হাত-পাগুলো অবশ লাগছে।

গোবিন্দ নীরবে শোনে।

দাওয়ায় ফিরে যাবার উপক্রম করতেই বসুইঘর থেকে মা ডেকে বলে আবার ভেতরে ঢুকলি কেন রে ? যা, ডুব দিয়ে আয় পুকুর থেকে—

তুমি একটু আগুন করে দাও দিকি।

বলে গোবিন্দ গটগট করে দাওয়ায় উঠতেই বসুইঘরে মা আর মাসি পিসি চেচামেচি জুড়ে দেয়, ঘর থেকে গগন বেরিয়ে এসে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে আহা হাহা এত বড়ো ধেড়ে মানুষটা, তোর কী বুদ্ধি বিবেচনা—আঁতুড় ঘেঁটে সেই কাপড়ে ঘরে ঢুকছিস ?

ঘরে ঢুকছি না।

গোবিন্দ ব্যাজার হয়ে দাওয়ায় উবু হয়ে বসে পড়ে।

গগন বলে, দাওয়ায় উঠলি কী বলে ?

গোবিন্দ কথা কয় না। বাড়ির মানুষেরা অনেকক্ষণ গজরগজর করে, বারবার গোবিন্দকে অন্তত ঘাটে গিয়ে কাপড়টা কেচে আসবার জন্য বলা হয়– কখনও মিনতি করে, কখনও রাগ দেখিয়ে।

শেষে গোবিন্দ বলে, আমার আর কাপড় নেই।

গগন বলে, আমার কাপড়টা দিচ্ছি তুই ঘাটে যা দিকি। ঘরদোর অশুচি করলে তোর ছেলে বউয়েরই অকল্যাণ আগে হবে, এই সিদে কথাটা বুঝিস নে তুই ?

গোবিন্দ অগত্যা ঘাটে গিয়ে ডুব দিয়ে আসে বাড়ির মানুষের চাপ বা পাপের ভয়েই ঠিক নয়। তার নিজের মনটাও খুঁতখুঁত করছিল। সে ঘাটে যেতেই অন্নদা তাড়াতাড়ি সমস্ত দাওয়াটা গোবর জলে লেপে দেয়।

ডোবাপুকুরে ডুব দিয়ে এসে বেরতীর একটা পুরানো ছেঁড়া শাড়ি দুমড়ে কোমরে জড়িয়ে ভিজে কাপড়টা দাওয়ায় টান করে মেলে দিয়ে গোবিন্দ দাওয়াতেই উবু হয়ে বসে আকাশ পাতাল ভাবে।

গগন পবনের কাপড়খানা ছেড়ে দিতে চাইলেও সে কাপড় পরা যায় না। গগনকে তাহলে গামছা পরতে হয়। গায়ে একটা কুর্তা আছে বটে কিন্তু এই ঠান্ডায় আধভেজা গামছা পরে থাকলে বুড়ো গগনকে নির্ঘাত বিছানা নিতে হবে।

এবং সম্ভবত বিছানা থেকেই তাকে চালান করতে হবে শ্মশানে।

ছেঁড়া শাড়িটা দিয়ে বাচ্চাটাকে আরেকটু ঢেকে দেবার কথা ভাবছিল। এখন বাধ্য হয়ে নিজের কোমরেই সেটা জড়াতে হয়।

বাড়ির চারিদিকে এককালে বেড়া ছিল, বছরখানেক হয় ভেঙে পড়েছে। গগনের মেটেপথ থেকে ঘরের দাওয়ায় বসা মানুষেরও বুক পর্যন্ত নজরে পড়ে।

জলে-কাদায় পিছল পথে জুতো হাতে নিয়ে আঙুল টিপে টিপে চলতে চলতে নরেন দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, খবর কী গোবিন্দ ?

গোবিন্দ উঠে গিয়ে বলে, আর খবর, খবর আমার চোদ্দোপুরুষের পিন্ডি।

অল্পক্ষণের জন্য বৃষ্টিটা একটু ধরেছিল, ভাঙা ছাতিটা ছিল নরেনের বগলে। তবে বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হবে সে আশা নেই। আকাশ দেখেই টের পাওয়া যায় খানিক বাদে আবার নামবে।

হোগলার চালাটার দিকে চেয়ে নরেন জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছে ?

এখনও টিকে আছে। বাচ্চাটা বোধ হয় ও বেলাই যাবে, ওর মা-টার হয়তো বা আরও দু-চার দিন লাগতে পারে।

নরেন গম্ভীর হয়ে বলে, তবু হাত-পা গুটিয়ে দাওয়ায় বসে আছ ? মানুষ খুন করলে পাপ হয় জানো না ? ঘরে নিলে যদি পাপ হয়, সেটা অনেক ছোটো পাপ।

গোবিন্দ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, হা ! পাপের কথা ভাবছে কে ? মন নয় একটু খুঁতখুঁত করবে, সাতপুরুষের নিয়ম ভাঙা হল। সে জন্য আটকে আছে নাকি ! ঘরে নিলে বাড়ির সবাই হাউমাউ করে উঠবে না ?

করুক হাউমাউ। তোমার ছেলেবউ তো বাঁচবে।

গোবিন্দ করুণভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করে। রোজ আপিস যাচ্ছ, মাসকাবারে বেতন গুনছ। বেকারের দশা কী বুঝবে ? ঘরবাড়ি বুড়ো বাপের, বাপের ঘাড়ে খাই। সোজা বলবে, ম্লেচ্ছ অনাচারী পাষণ্ড, বেরো আমার বাড়ি থেকে, দূর হয়ে যা।

নরেন সঙ্গে সঙ্গে বলে, বলুক না ? পরে নয় বেরিয়েই যাবে, আজ তো ওদের বাঁচাও ! গায়ের জোরে তো ওরা পারবে না তোমার সঙ্গে ? গায়ের জোরে ঘরে নিয়ে যাও। কয়লা কাঠ না থাকে, ঘরের খুঁটি ভেঙে আগুন করে সেঁক দাও। এটুকু যদি না কর, আমি তোমাকে খুনি বলব। বলে বেড়াব, তুমিই নিজের বউছেলেকে খুন করেছ।

নরেন আর দাঁড়ায় না। আটটার গাড়ি ধরতে না পারলে অফিসে লেট হয়ে যাবে। সেটা কম বিপদের কথা নয়, তবু আরও কিছুক্ষণ দাঁড়ালে যদি কিছু লাভ থাকত তবে না হয় আজ লেটই করত। গোবিন্দকেও তো সে জানে। বাড়িব লোক হাউমাউ করবে এটা বাজে অজুহাত, আসল বাধা গোবিন্দের নিজের মনে।

নিজের মন থেকেই সে সায় পাচ্ছে না। নইলে বাড়ির লোকের অসন্তোষের খাতিরে কেউ চোখের সামনে বউছেলেকে মরে যেতে দিতে পারে—ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটু আড়াল আর আগুনের তাপের ব্যবস্থা করলেই দুজনে বেঁচে যাবে যখন জানা আছে ?

এদিকে গোবিন্দ গালে হাত দিয়ে বসে নিজের মনে বলে, এতই যেন সহজ !

মুখে বলা আর কাজে করা।

ওদের ঘরে তুলবার চেষ্টা করলেই যে কী কাণ্ড শুরু হবে নরেন তার কী জানবে ? সে তার গায়ের জোরটাই দেখছে, গায়ের জোরটাই যেন সব।

গায়ের জোরে যেন তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করা হবে আর জোরে না পারলে হার মেনে শুধু চেঁচামেচি করে তাকে দূর হয়ে যেতে বলেই সবাই ক্ষান্ত থাকবে।

হঠাৎ সত্যিকারের উন্মাদ হয়ে যাবে বুড়ো বাপটা, বুক চাপড়ে চেঁচিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ে জলে-কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে তো বা মেরেই ফেলবে নিজেকে।

মা ঘরের কোনার সিঁদুর মাখানো পটটার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একটানা আর্তনাদ করে যাবে এবং খুব সম্ভব একফাঁকে এই শীত-বাদলার মধ্যে এক কাপড়ে বেরিয়ে চলে যাবে যেদিকে দুচোখ যায়।

অন্যেরা কী করবে সে হিসাব নয় নাই ধরল। মা-বাপের কথাটা না ভাবলে চলে কী করে ?

গোবিন্দ অসহায়ের মতো চেয়ে থাকে। মনে হয়, সে যেন জাঁতাকলে পড়েছে, যে জাঁতাকলে মানুষের ভেতরটা পিষে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। নরেন কী করে বুঝবে চোখের সামনে ছেলেবউকে

অত্যাচারের হাতে মরতে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হলে মুহূর্তগুলি কেমন করাতের দাঁতের মতো হয়ে ওঠে, সময় কীভাবে প্রাণটাকে ধীরে ধীরে চিরে চিরে দিয়ে যেতে থাকে।

কাঠের উনানের কিছু জ্বলন্ত কয়লা একটা সরায় নিয়ে গামছা পরে অন্নদা আঁতুড়ে যায়—বেরিয়ে ঘাটে গিয়ে ডুব দিয়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকবে।

একটু পরেই অন্নদা বেরিয়ে আসে, গোবিন্দের ছোটোপিসিকে ডেকে আঁতুড়ে পাঠিয়ে দেয়।

ঘাটে যাবার বদলে ছেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বলে, ভাবিস কেন ? ভগবানকে ডাক।

ভগবান তো সবই করছেন।

ও কথা বলতে নেই বাবা !

একটু ইতস্তত করে অন্নদা আবার বলে, টিন জোগাড় হয় না ?

কোথা পাব ?

একটু দাঁড়িয়ে নিজের মনে কী যেন ভাবে অন্নদা, তারপর ঘাটে গিয়ে স্নান করে গামছা কেচে শুদ্ধ হয়ে না এসেই ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকে !

গোবিন্দ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে মা কী ভুলে গেছে তার সদ্য সদ্য আঁতুড় থেকে বেরিয়ে আসার কথা ?

খানিক আগে তাকে আঁতুড় থেকে বেরিয়ে শুধু দাওয়ায় উঠতে দেখে চেঁচামেচি জুড়েছিল, ঘাটে গিয়ে ডুব দিয়ে আসতে বাধ্য করেছিল, আর নিজের বেলা সব ভুলে গিয়ে সোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল !

কী আজব ব্যাপার।

তারপর ভিতরে গগনের সঙ্গে তাকে নিচুগলায় কথা বলতে শুনে গোবিন্দের প্রাণটা ছলাত করে ওঠে।

শেষ হয়ে গেছে ? আঁতুড়ের মৃত্যুর ধাক্কায় মা-র খেয়াল নেই স্নান থেকে বেরিয়ে স্নান না করে ঘরে ঢোকা চলে না ?

বাচ্চাটা ? না, বউটা ?

উঠে গিয়ে দেখে আসবে সে শক্তি যেন গোবিন্দ পায় না। বসে বসে সে একটা কথাই বার-বার মনে এনে সে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে যে চিৎকার করে চেঁচিয়ে কেঁদে না উঠে মরণকে এমন চুপচাপ বরণ করার মানুষ তো তার মা নয় !

বাচ্চাটা শেষ হয়ে গিয়ে থাকলেও এতক্ষণে মা-র কান্নার আওয়াজে চারিপাশের অনেক বাড়িতেই জানাজানি হয়ে যেত, এ বাড়িতে মৃত্যুর পদার্পণ ঘটেছে।

খানিক পরে গগন আর অন্নদা দাওয়ায় বেরিয়ে আসে।

গগন জিজ্ঞাসা করে, একটা কিছু ব্যবস্থার কথা ভেবে পাচ্ছ না ?

গোবিন্দ বলে, কী আর ব্যবস্থা করব ?

গগন আপশোশ করে বলে, হাতে একটা পয়সা নেই যে কিছু করি। পাঁচজনের কাছে ধার জমে আছে, আবার গিয়ে চাইলে কেউ দেবে না। কপাল রে !

অন্নদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

গোবিন্দ নীরবে দুজনের ভাব লক্ষ করে।

তার মনে হয় শুধু এই কথাগুলি বলার জন্য ঘরের মধ্যে পরামর্শ করে তারা যেন দাওয়ায় আসেনি, এটা নিছক ভূমিকা, তাদের আরও কিছু বলার আছে এবং সেটাই আসল বক্তব্য।

গগন বলতে যায়, আমি ভাবছিলাম কী—

অন্নদা তাড়াতাড়ি যোগ দেয়, মাথা ঠান্ডা করে শুনিস বাবা, কথাটা, একটু বিবেচনা করে দেখিস। এমন ঝপ করে খেপে যাস, তোকে কিছু বলতেই ভয় হয়।

গোবিন্দ ধীরে বলে, কী বলছ শুনি না ?

গগন বলে, বউমাকে ওখান থেকে সরাতে হয়, বাচ্চাটা তেমন নড়াচড়া করছে না।

অন্নদা বলে, এমনি কড়া শীত হলে ভাবনা ছিল না, বাদলটা নামায় হয়েছে মুশকিল।

গোবিন্দ নীরবে প্রতীক্ষা করে।

সে টের পায় তার কাছে হঠাৎ কথাটা পাড়তে গগনও সাহস পাচ্ছে না, ইতস্তত করছে। গোবিন্দ আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে ঘরের মধ্যে এতটুকু সময় একটু পরামর্শ করেই কী এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা তারা ঠিক করে ফেলেছে যা তাকে বলতে গিয়ে এতখানি ভূমিকা দরকার হয়, এতবার ঠেকে গিয়ে গগনকে ঢোক গিলতে হয় ?

দুজনে চুপ করে আছে দেখে গোবিন্দ শান্তভাবে বলে, কী বলছিলে বলো না ?

কথাটা শেষ পর্যন্ত বলে ফ্যালে অন্নদাই।

বলে, আমরা বউমাদের ঘরে আনব ঠিক করেছি, তুই কিছু বলতে পারবি না।

গগন তাড়াতাড়ি বলে, ওখান থেকে না সরালে বাঁচবে না।

গোবিন্দ হতবাক হয়ে থাকে।

তার বউ ও বাচ্চাটাকে ঘরে আনার প্রস্তাবে সে সম্মতি দিতে পারছে না ধরে নিয়েই যেন গগন তাকে বুঝিয়ে বলে, এমন কিছু দোষ হবে না। একটা কোনা সাফ করে পুরনো তক্তপোশটা পেতে দিলেই হবে, পরে নয় ফেলেই দেব ওটা। আঁতুড় উঠলে ঠাকুরমশায়কে ডেকে ঘরটা সুদ্ধ করে নেয়া, একটা প্রাচিত্তির করা—ফুরিয়ে গেল। এতে আপত্তি করার কী আছে ?

অন্নদা হঠাৎ যেন ছেলের ওপর বিষম চটে যায়। চেঁচিয়ে জোর দিয়ে বলে, না তোর মানা শুনব না আমরা, ছেলের ঘরের প্রথম নাতি—

তার গলার কথা আটকে যায়।

গোবিন্দের মনে হয় ভেতর থেকে যেন প্রচণ্ড একটা হাসির বেগই ঠেলে উঠেছে, কিন্তু হাসি তার আসে না।

কোনো রকমে সে উচ্চারণ করে, আনো ঘরে।

অন্নদা তারই অনুমতির জন্যই যেন কোনো রকমে ধৈর্য ধরেছিল, আঁতুড়ে ছুটে যায়। আগুনের মালসা হাতে নিয়ে একটা ন্যাকড়ার পুটলি বুকে করে এসে ঘরে ঢোকে।

গোবিন্দের চমক ভাঙে অন্নদার ডাকেই।

পাঁজাকোলা করে তুই বউমাকে তুলে নিয়ে আয় বাবা। উঠে আসতে পারবে না।

মহাকর্কট বটিকা

ঘুষঘুষে জ্বর ছিল। খুকখুক কাশি।

তার ওপর গলা দিয়ে উঠল দুফোঁটা রক্ত।

তাজা লালরক্ত।

আরও কী লক্ষণ দরকার হয় ব্যাপার বুঝতে এর পরেও কী মানুষ খানিকটা হয়তো মেশানো আশাও করতে পারে যে জ্বর কাশি আর রক্ত ওঠাটা সে রকম ভয়ানক কিছু নয়, নাও হতে পারে?

এতটুকু রক্ত। একটু আঙুল কাটলে তার চেয়ে কত বেশি রক্ত পড়ে। হারাণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মৃত্যুর এই সংক্ষিপ্ত লাল পরোয়ানার দিকে।

বলে, আর ভাবনা নেই। এবার সব ফিনিস।

ছাইবর্ণ হয়ে গেছে লতার মুখ। শুধু হাত পা নয়, ভেতরটাও তার থরথর করে কাঁপছে। সেই সঙ্গে দুলছে যেন সমস্ত পৃথিবী। কিন্তু তবু আশা সে ছাড়বে না। মনে হচ্ছে দুঃখ দুর্দশা ভরা সমস্ত অতীত জীবনটা যেন গভীর কালো হতাশার রূপ নিয়ে অন্ধকার করে দিয়েছে ভবিষ্যৎ, তারও আর বাঁচার জন্য লড়াই করার মানে থাকল না।

না না, হয়তো কিছুই নয়। ডাক্তার না দেখিয়ে কিছু বলা যায়? পরীক্ষা না করিয়ে?

ডাক্তার অবশ্য দেখাবো। এক্স রে ফটোও তোলা হবে। কিন্তু সেটা প্রমাণের জন্য নয়। কতদূর এগিয়েছে রোগটা, কী অবস্থা, বুঝবার জন্য।

মৃত্যু যেন এখনই ঘনিয়ে আসছে এমনি হতাশা হারাণের চোখে।

লতা একবার চোখ বোজে। জোর চাই বুকে বল চাই। এভাবে কাপলে, সবাঙ্গ অবশ হয়ে এলে চলবে কেন? সেও যদি হাল ছেড়ে দেয়, সবনাশ ঠেকাবার কেউও যে হবে না?

চোখ মেলে সে কথা বলে। নিজের কথাগুলি নিজের কানে তার লাগে অন্য কারও কথার মতো।

যদিই বা হয়ে থাকে, চিকিৎসা করলে সেরে যাবে। আজকাল কত ভালো চিকিৎসা বেরিয়েছে, বেশির ভাগ সেরে যায়। নন্দবাবুর ছেলেটা সেরে ওঠেনি?

হারাণ আর কিছু বলে না।

এ রোগ সারিয়ে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আশা সে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু লতাকে কাবু করে লাভ নেই।

বাড়িওলা নন্দবাবুর ছেলে। মাছ, মাংস দুধ, ঘি, সন্দেশ খেয়ে আর অজস্র বিশ্রামের সুযোগ ভোগ করেও তার এ রোগ হয়েছিল কেন কে জানে। বোধ হয় না-কৃত খেয়ালে শরীরটাকে কাবু করেছিল বলে। মৃত্যুর পরোয়ানা পাওয়ামাত্র ভড়কে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল নন্দবাবুর অজস্র পয়সা খরচ করা ওষুধ পথ্য আলো বাতাস বিশ্রামের চিকিৎসায়।

ছ-মাসে সে শুধু সেরেই ওঠেনি, দিব্যি নাদুসনুদুস চেহারা বাগিয়েছে। স্বাস্থ্য যেন পুষ্টিরসে রসস্থ হয়ে উথলে পড়েছে তার সর্বাঙ্গে।

কিন্তু কম খেয়ে বেশি খেটে সে বাঁধিয়েছে রোগ—নিজে বাঁচার জন্য আর আপনজনকে বাঁচানোর জন্য শরীরকে পুষ্টি না দিয়ে ক্ষয়, একটানা ক্ষয় করে এসেছে শক্তি আর স্বাস্থ্য। কী দিয়ে এখন সে লড়বে এ রোগের সঙ্গে? সুস্থ দেহ নিয়ে যা ঠেকানো যায়নি, এসে চেপে ধরে কাবু করার পর অসুস্থ দেহ নিয়ে সেটাকে দূর করার বাড়তি ক্ষমতা সে কোথায় পাবে?

আর হয় না। এবার শুধু দিন গোনা।

শচীনের সব জানাশোনা আছে। তাকে বলতে সে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেয়। সেই সঙ্গে তাদের সাবধান করে দেয় যে বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা যেন কিছু জানতে না পায়।

বুক পরীক্ষার ফল জানা যায়। চিকিৎসার বিস্তারিত বিধানও পাওয়া যায়।

ডাক্তারের কাছ থেকে লতা নিজে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয়। শুধু কী করতে হবে জেনে নেওয়া নয়, যতটা পারে বুঝেও নেয়, কীসে কী হয় আর কেন হয়, কোন ব্যবস্থার গুরুত্ব কতখানি।

না খাটলে যার পেট চলে না তার কী রাজসিক রোগ !

দামি ওষুধ চাই, দামি পথ্য চাই, সূর্যের আলো চাই, মুক্তবায়ু চাই, আরামে বিশ্রাম চাই, আর চাই আনন্দ, আশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস।

ঘিঞ্জি পাড়ায় গলির মধ্যে পুরানো বাড়ির আধা-অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে একখানা ঘর, দুবেলা নিজেদের এবং আরও অনেকের উনানের ধোঁয়া ঘর ছেড়ে যেন যেতে চায় না। এই ঘরে যাদের বাস, দুটি বাচ্চার জন্য যাদের শুধু একপোয়া দুধ বরাদ্দ, মাসের গোড়ার দিকে মোট দুটো-চারটে দিন যারা মাছের স্বাদ পায়, অভাব ও দুর্ভাবনায় জ্বরজ্বর হয়ে যাদের মাস কাবার হয়, তাদের আজ এত সব বাড়তি ব্যবস্থা দরকার।

একটা অদ্ভুত হাসি মুখে ফুটিয়ে হারাণ বলে, বাদ দাও। এত ব্যবস্থাও হয়েছে, আমার রোগও সেরেছে। অনর্থক কতগুলি টাকা নষ্ট হবে।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে ক্ষীণাঙ্গী লতা সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ধমক দিয়ে বলে, দ্যাখো তুমি রোগী মানুষ, তোমার অত বাহাদুরি কেন ? তুমি চুপ করে থাকো। আমাকেও তুমি ভড়কে দিচ্ছ !

তুমি আর কী করবে বলো ?

চেষ্টা তো করব ?

না। মিছে চেষ্টা করে লাভ নেই। যেটুকু সম্বল আছে তাতে এ রোগ সারে না। এ সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নয় লতা, জেনেশুনে সম্বলটুকু খুইয়ে তুমি পথে বসতে পাবে না। সামান্য একটু চান্স থাকলেও বরং কথা ছিল।

লতা আবার ধমক দেয়, চুপ করবে তুমি ? কে বললে তোমার চান্স নেই ? রোগ বাধিয়ে এখন কর্তালি করতে এসো না। আমায় বুঝেশুনে ব্যবস্থা করতে দাও। মাথা ঠান্ডা রেখে আমায় সব করতে হবে, আমার মাথা গুলিয়ে দিয়ো না।

মাথা উঁচু করে সে আবার বলে, তেমন মেয়ে পেয়েছ নাকি আমায়, চেষ্টা না করেই হাল ছেড়ে দেব ?

মুখে যাই বলুক হারাণ, মৃতদেহে সে যেন একটু প্রাণ পায়।

লতা বলে, আপিস থেকে লোন-টোন যে বাবদে যতটা পারো ব্যবস্থা করবে। লম্বা ছুটির দরখাস্ত করবে।

ছুটি ? ছুটি নিলে মাইনে পাব না।

জানি। সে ভাবনা তোমার নয়। আপিসেও খাটবে, অসুখও সারবে, না ?

আগে চাই টাকা, তারপর অন্য কথা। যেখানে যেভাবে যতটুকু পাওয়া সম্ভব, লতা টাকা কুড়োতে আরম্ভ করে। বাপ গরিব, টাকা দেবার সাধ্য নেই, লতা বাচ্চা দুটিকে মার কাছে রেখে আসে। ওদের খরচটা বাঁচবে, ওরাও ছোঁয়াচ থেকে বাঁচবে, সে নির্ঝঞ্ঝাটে লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে রোগটার বিরুদ্ধে।

গয়না থেকে শুরু করে যা কিছু বেচা সম্ভব সব সে বেচে দেয়। আত্মীয়স্বজন যার কাছে যতটুকু সাহায্য বা ঋণ পাওয়া সম্ভব আদায় করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়।

কাঁদাকাটা করা থেকে হাতে পায়ে ধরা, একেবারে নাছোড়বান্দার মতো এঁটে থেকে জীবন অতিষ্ঠ করে তোলা ইত্যাদি যত রকম উপায় আছে আত্মীয়বন্ধুর কাছে সাহায্য আদায়ের, তার কোনোটাই সে বাদ দেয় না। মান অপমানের বোধটা একেবারে ছাঁটাই করে সে যেন চারিদিকে আক্রমণ চালায়।

শচীন বলে দিয়েছিল, অন্য ভাড়াটেরা যেন হারাণের অসুখ টের না পায়। কিন্তু সর্বস্বপণ করে চিকিৎসা আরম্ভ করে দেবার পরেও কী আর এই মহারোগ গোপন করা যায়।

লতা টের পায়, বাড়ির অন্য বাসিন্দারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। একবাড়িতে থেকেও যতদূর সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

পাশের ঘরে থাকে হেমেন। তার স্ত্রী রমার সঙ্গে এতদিন খুব ভাব ছিল লতার।

সেদিন তার ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই রমা মুখ কালো করে বলে, উনি বলছিলেন, তোমার কারও ঘরে না যাওয়াই উচিত।

আমি খুব সাবধান থাকি। ওষুধ দিয়ে হাত ধোয়া, কাপড় ছাড়া

তবু বলা তো যায় না।

লতা নীরবে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, বেশ, এ জন্মে আর ঢুকবো না তোমার ঘরে।

অন্য ভাড়াটেরা গিয়ে চাপ দেয় বাড়িওলা নন্দকে। নন্দ এসে বলে, দেখুন, আপনাদের অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত। আপনারা না গেলে অন্য সবাই চলে যাবেন বলেছেন।

লতা বলে, আমরা চলে যেতেই চাচ্ছি। একটু আলো বাতাসওলা ঘর খুঁজছি—পেলেই উঠে যাব। আপনারা দিন না খোঁজ করে?

নন্দ বলে, এ কী একটা কথা হল? মনের মতো ঘর না পেলে আপনারা যাবেন না, এতগুলি লোকের অসুবিধা করবেন? দু চারটা দিন দেখে আমি কিন্তু বাধ্য হয়ে—

বাধ্য হয়ে সে যে কী করবে না বললেও বোঝা যায়। অন্য সব ভাড়াটেরা তার পক্ষে, কাজেই তার জোর বেড়েছে।

লতা ভয় পায় সত্যই কিন্তু বাইরে তেজ দেখিয়ে বলে, সে আপনি যা পারেন করবেন। ঘর না পেলে রোগা মানুষটাকে নিয়ে আমি রাস্তায় নামব নাকি? নিয়মমতো ভাড়া গুনছি না?

শচীন একটা মীমাংসা করে দেয়। বলে, দেখুন, বাবাকে বলে ছাদে আমি একটা শেড তুলে দিচ্ছি। যতদিন ঘর না পান ওইখানেই আপনারা থাকুন? তাছাড়া, অন্য বাড়িতে ঘরভাড়া নিলেও এই ব্যাপার ঘটবে। একেবারে সেপারেট একখানা ঘর পাওয়া মুশকিলের কথা।

লতা চোখ তুলে তাকায়। শচীন তার দিকেই চেয়ে আছে। চোখের লোভটুকু বোধ হয় নিছক অভ্যাস। কারণ তার সহানুভূতি যে খাঁটি তাতে সন্দেহ নেই।

সে বলে, তাই দিন। আমার আলো বাতাসের সমস্যাও মিটবে।

ভাড়াটেরা এ ব্যবস্থা মেনে নেয়। কারণ শচীন বলেছে যে ছাদে জলের ব্যবস্থাও সে করে দেবে, লতাকে জলের জন্য নীচে এসে সকলকে ছোঁয়াছুঁয়ি করতে হবে না। সকলের কাছ থেকে প্রায় পৃথক হয়েই থাকবে লতারা।

লতার জলের সৌভাগ্যে কারও কারও মনে বেশ ঈর্ষাও জাগে।

কয়েক দিন পরে জিনিসপত্র নিয়ে হারাণ ও লতা খোলা ছাদে টিনের চালের অস্থায়ী ঘরখানায় উঠে যায়।

হেমেন শচীনকে জিজ্ঞাসা করে, সারবে ?

শচীন বলে, সব নির্ভর করছে চিকিৎসা চালিয়ে যাবার ওপর। অনেকদিন টানতে হবে। বিষম খরচ।

হেমেন বলে, তা হচ্ছে। ভদ্রলোক সত্যি ভাগ্যবান—এমন চালাক চতুর স্ত্রী পেয়েছিলেন। রমা বলে, আগে মোটেই এ রকম ছিল না। হারাণবাবুর অসুখটা ধরা পড়বার পর কেমন অদ্ভুত রকম পালটে গেছে।

রীতিমতো বিস্ময়ের সঙ্গেই সকলে এটা লক্ষ করেছিল। সমস্ত দায়িত্ব লতা একা নিয়েছে, একা সব পালন করে চলেছে। বাইরে গিয়ে ওষুধ-পথ্য কিনে আনা থেকে হারাণের সেবাশুশ্রূষা সব কিছু দায়িত্ব। চিকিৎসা আর আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি যে সত্যই কী বাজসিক ব্যাপাব সেটা কারও অজানা নেই। মেয়েরা কৌতূহলের বশে একে একে সকলেই লতাব কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে কী দিয়ে কী হয় এবং কীসে কী লাগে।

লতা কিছুই গোপন করেনি।

বরং যারা গোড়ায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বাড়ি থেকে তাদেব তাড়াতে ব্যাকুল হযেছিল, জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে তাদের যে সমবেদনা প্রকাশ পায় তাতে সে খুশিই হয।

কিন্তু লোকের মনে প্রশ্ন জাগে, কতদিন এভাবে চালাবে লতা ?

কী করে চালাবে ?

তাব অবস্থাও তো কারও অজানা নয় !

তাই মাস দুই পরে লতার মুখে দুশ্চিন্তার কালচে ছায়া পড়েছে দেখে বমা হেমেনকে বলে, আর বুঝি টানতে পারছে না বেচারা।

হেমেন বলে, কী করে টানবে ? এ তো জানা কথাই।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করে সেদিন প্রথম রমা ছাদে যায়—স্নান কবার আগে যায —নীচে নেমেই সাবান মেখে নেয়ে সব ছোঁয়াছুঁয়ি ধুয়ে ফেলবে।

রমা বলে, কী করে খরচ চালাচ্ছ ?

লতা বলে, যা ছিল ফুরিয়ে এল, এবাব কিছু করতে হবে।

কী করবে ?

দেখা যাক। একটা উপায় করতেই হবে।

রমা দারুণ অস্বস্তির সঙ্গে ভাবে কে জানে কী উপায়ের কথা ভাবছে লতা। নিরুপায় মেয়েমানুষ, ভেবে সে কী উপায় বার করবে !

কয়েক দিন পরে বাড়ির সকলে লক্ষ করে যে সকালে ঘরের রান্নাবান্না কাজকর্ম সেরে সাড়ে-দশটা এগারোটার সময় লতা বেরিয়ে যায়।

ফিরে আসে সন্ধ্যার সময়।

কী ব্যাপার ?

রমাই তাকে জিজ্ঞাসা করে সকলের আগে।

লতা বলে, একটা কাজ পেয়েছি।

কী কাজ ?

লতা একটু ইতস্তত করে বলে, একজনের বাড়িতে নার্সিংয়ের কাজ।

এরপর বেশি সে আর কিছু বলে না।

দিন যায়। একটা লেডিজ ব্যাগ হাতে লতা রোজ নিয়মমতো বেরিয়ে গিয়ে ফিরে আসে। হারাণের চিকিৎসা পুরো দমে চলে। ধীরে ধীরে তার শরীরে অস্বাস্থ্যের ক্লিষ্ট ছাপ কেটে গিয়ে স্বাস্থ্যের জ্যোতি ফিরে আসতে থাকে।

সকলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে নার্সিংযের কাজ ? জীবনে প্রথম রুগ্‌ণ স্বামীর সেবা আরম্ভ করেই কী এমন ট্রেইনড নার্স হযে গেল যে তাকে এত টাকা মাইনে দিয়ে লোকে রেখেছে, হাবাণের চিকিৎসার বিরাট খরচ যাতে চালানো যায় ?

হেমেন রমাকে বলে, তুমিও যেমন, ওই কথা বিশ্বাস কবলে। বয়স আছে, চেহাবাটা মন্দ নয়—

তাই কী ? স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে নিজেকে এইভাবে বলি দিতে হয়েছে লতাকে ?

রমা নিশ্বাস ফেলে।

শচীনও ভাবছিল, ব্যাপারটা কী ?

লতার মুখে যখন দুশ্চিন্তার কালো ছাপ পড়েছিল, একদিন কযেকখানা নোট পকেটে নিয়ে শচীন বিকেলেব দিকে তার কাছে গিযেছিল। হারাণ তখন বেড়াতে গেছে।

বলেছিল, দেখুন, আমিও এ রোগে মবতে বসেছিলাম। আমাব কাছে টাকা নিলে কোনো দোষ নেই।

লতা বলেছিল, আপনি অনেক করেছেন। আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। টাকার দরকার নেই।

তবু শচীন নড়ে না দেখে লতা বলেছিল, টাকা দিয়ে কেনার মানুষ আমি নই শচীনবাবু।

শচীনের রাগ হযেছিল খুব। তাবপর আর কোনো খবর নেয়নি। পথে মুখোমুখি হলেও যেচে কথা বলেনি।

কিন্তু সেদিন বিকালের দিকে এমনভাবেই তাকে মুখোমুখি হতে হল লতার যে বাগ নিয়ে পাশ কাটিযে যাওয়ার সাধ্য তার হল না।

জনাকীর্ণ রাজপথ। তাবই ধাবে ফুটপাতে কম্বল বিছিযে লতা বসে আছে। তাব পিছনে দেযালে হেলান দিয়ে রাখা মস্ত একটা বিজ্ঞাপন।

যক্ষ্মা নিবাবণী মহাকর্কট বটিকা।

এই বটিকায় আমার স্বামীব যক্ষ্মা সারিযাছে।

সপ্তাহে একটি বটিকা সেবনে যক্ষ্মার ভয থাকে না।

প্রতি বটিকা--এক আনা।

কত পয়সা কতদিকে যায়—সপ্তাহে এক আনা খবচে মহাবোগ ঠেকান।

শচীন একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। লতা একটু হাসে।

তখন আপিস ছুটি হয়েছে। বিক্রিব সময়। খানিক তফাতে শচীন অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্ধ্যার খানিক আগে লতা উঠে বিজ্ঞাপনটি ভাঁজ করে, কম্বলটি তুলে গুটিযে নেয়, ব্যাগটি হাতে করে এগিয়ে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়ায়।

শচীন কাছে গিয়ে বলে, এতে সত্যিসত্যি চলছে আপনার ?

লতা বলে, চলছে বইকী। হাতে কিছু পয়সাও জমেছে। আশ্চর্য হচ্ছেন কেন ? যে দেশে কাশি হলে ফাঁসির আতঙ্ক জাগে, সে দেশে এক আনা খরচ করে লোকে নিশ্চিন্ত হতে চাইবে না ?

শচীন বুঝতে পারে, লতা ফাঁসি বলতে টিবি-র কথাই বলছে।

আর না কান্না

কান্না গল্পের সাত বছরের ছিচকাঁদুনে মেয়েটা মাইরি আমায় অবাক করেছে। যেমন মা-বাবা, তেমনই মেয়ে। শুধু কান্না আর কান্না।

যত চাও রুটি খাও শুনে কোথায় খুশিতে ডগমগ হবে, ভাববে যাকগে, আজকে পেটটা আমার ভরবেই ভরবে—তা নয়। একমুঠো ভাতের জন্য কান্না। রেশনের চালের ভাত ! রুটি এমনি চিবোলে মিঠে লাগে, একটু গুড় পেলে মাখিয়ে নিলে হয়ে যায় একেবারে পাটিসাপটা পিঠে। রুটি খেয়ে পেট ভরে জল খাও, তার কাছে নাকি ভাত খাওয়ার পেট ভরা ! ছিটেফোঁটা ডাল, এইটুকু তরকারি, তাই দিয়ে ছিরি আছে নাকি ভাত খাওয়ার ?

প্রাণটা ভাত চেয়ে চোঁ চোঁ করে, বইকী ভেতো মনিষ্যির। বড়োদের আরও বেশি করে। কিন্তু ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসলে প্রাণটা যে আবার লাগসই পরিমাণে ভালো তরকারি মাছ চায় মশাই ! শুধু ডাল হোক, শুধু একটা তরকারি হোক, তাই দিয়ে এক দিস্তে রুটি মেরে দেওয়া যায় (যেন এক দিস্তে রুটি গরিবদের মেরে দিতে দিচ্ছে দুর্ভিক্ষ-পোষক সদাশয় কংগ্রেস সরকার)। রুটি স্রেফ ভুলিয়ে দেয় মাছের শোক। বাটিভরা ডাল নেই, ভাজা নেই (তেল লাগে !) চচ্চড়ি, শুক্ত, মরিচ ঝোল, ডালনা-ফালনার যে কোনো একটা যদি থাকে তো দু-গেরাসের বেশি ভাত মাখার মতো নেই, নাকে একটু আঁশটে গন্ধ নেই, —সারাদিন হাড়ভাঙা খাটনি খেটে রাত এগারোটায় হয় কাদার মতো গলা গলা আর নয়তো কড়কড়ে শক্ত ভাত খেতে পেয়ে কে যে সুখে একদম গদগদ হয় বাংলায় ?

ঠান্ডা বরফ ভাত !

সেটা ভুললে চলবে না। রান্না হয় সন্ধ্যায়—গুদাম-পচা সরকারি চালের বোঁটকা গন্ধেই বুঝি ন্যাকা মেয়ের ভাতের জন্য কান্না বাড়ে ! কর্তাকে গরম গরম ভাত দিয়ে খুশি করতে যে গিন্নি রাত এগারোটা পর্যন্ত উনানে কয়লা পোড়াবে, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে যে কর্তাব্যক্তিটা সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত খেটে মরে সে মানুষটা গিন্নির সাথে কাব্যি করবে না, মারবে এক চাঁটি।

গা-ঘেঁষা ঘর। যতীনের একগন্ডা ছেলেমেয়ে আবদার তোলে শুনতে পাই, এ বেলা রুটি করো মা, রুটি করো। করো না রুটি ? আটা কম তো কম করে করো না ! ভাতের সঙ্গে একটা-দুটো করে খাব।

বাবারে বাবা, কী রুটিই তোরা খেতে পারিস !

একটা করে দিয়ো ?

দাঁড়া দেখি হিসেব করে।

হিসাব ছাড়া পথ নেই। সব বিষয়ে সব কিছুর গোনা-গাঁথা ওজন করা হিসাব দিয়ে কোনোমতে দিন গুজরান। আটার পরিমাণ দেখে অবলা তার জীর্ণ পুরানো সেলাই করা ব্লাউজটা গা থেকে খুলে ফেলে দিতে দিতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

না, এ বেলা রুটি হবে না।

শুধু এ বেলা নয়, এ হপ্তার বাকি ক-টা দিন আর রুটি পাবে না কেউ, ভাতের সঙ্গে দুখানা একখানাও নয়। সকাল আটটায় বেরিয়ে রাত এগারোটায় ফিরবে যে মানুষটা, ক-দিন তার বাইরে খাবার জন্য রুটি করে দিতেই এ আটাটুকু লেগে যাবে। বাইরে কিনে খেতে বড্ড খরচ।

তবু আবদারের কলরব ওঠে—ছোটো দুজনের। তারা এখনও ভাব-জগতের মায়া একেবারে কাটিয়ে উঠে বাস্তব জগতের কঠোরতা সম্পূর্ণ মানতে পারেনি, এখনও বুকে আশা নিয়েই আবদার করে। তবে এক ধমকে তারা থেমে যায়।

সাত বছরের মেজোমেয়েটা ফোঁস করে ওঠে, তুমি সব বাবার জন্যে রেখে দেবে। আমরা ভেসে এসেছি ? বাবা বলে কত কিছু কিনে খায়—

তার গালে একটা চড় পড়ে সশব্দে।

চড়চাপড় এই মেয়েটাই খায়। ওর স্বাস্থ্যটাই ভালো, খিদেও বেশি—ওই বেশি খাইখাই করে। অন্য তিনজনেই রোগা দুর্বল—দশ বছরের বড়োমেয়েটা তো প্যাঁকাটির মতো দেখতে। ওদের গায়ে হাত তুলতে ভরসা হয় না—হয়তো মরেই যাবে, খিদেয় কাতর বাপের চড় খেয়ে চাষির যে ছেলেটার মরে যাবার খবর খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তার মতো।

অন্য তিনজনকে বশে আনতে অনেক সময় শাসন জোটে একা ওই সাত বছরের মেজোমেয়েটার।

রোগা ক্ষীণজীবী বড়োমেয়েটা দু-চারখানা বাসন মাজে, ঘটিতে করে জল তোলে, ঘর ঝাঁট দেয়, দোকানে যায়। পুতুল খেলা ফেলে মেজোবোন দিদির সাথে হাত লাগায়। পুতুল খেলার চেয়ে তার ভালো লাগে টুকটাক সংসারের কাজ করার খেলা।

সে দিদির কাজ করে, মা-র কাজ নয়। মা-র সঙ্গে তার বিবাদ। সে মিনতি করে বলে, দিদি, আমায় দে না বাটিটা মাজি।

মা বাটিটা এগিয়ে দিতে বললে সে শুনতে পায় না। ধমক দিয়ে হুকুম করলে অনিচ্ছার সঙ্গে ওঠে, পুতুলকে বলে যায়, বোস বাছা একটু, পরে খেতে দেব। রাক্ষুসি ডাকছে।

আটটা বাজবার আগেই ঝিমিয়ে নেতিয়ে আসে চারজন। সেটাও মেজাজ বিগড়ে দেয় অবলার, কিন্তু বেচারিরা করবে কী ? খাদ্যে মেটে ক্ষয়ের পূরণ আর পুষ্টির প্রয়োজন ঘুম তাই ঘনিয়ে আসে আরও বেশি ক্ষয় ঠেকাতে। এ বিষয়ে প্রকৃতি ছেড়ে কথা কয় না কাউকে। ওই তেতলা বাড়ির ভুঁড়িওলা মালিক ঘনশ্যামবাবু : সাতজন ভাড়াটের কাছে লোকটা মাসে বাড়িভাড়াই পায় চারশো টাকার মতো—অনিদ্রা রোগ খুব বেশি বেড়ে গেলে মাঝে মাঝে তাকেও মাছ মাংস মিঠাই মণ্ডা একেবারে বাদ দিয়ে উপোস করতে হয় ! অতিপুষ্ট শরীরটা তার যথারীতি পুষ্টি না পেয়ে আপসে একটু ঘুম এনে দিয়ে নিদ্রাহীনতার অসহ্য কষ্টে তাকে পাগল হতে দেয় না।

চারজনে একসঙ্গে খেতে বসে। তার মানে চারজনকেই একসঙ্গে বসানো হয়, একসঙ্গে চুকিয়ে দিলেই হাঙ্গামা চুকে যায়।

অবলারও সহ্যর সীমা আছে তো।

আমি আলু পাইনি মা !

আমায় ডাঁটা দিলে না যে ?

এট্টুখানি ডাল দাও মা, শুধু এট্টুখানি !

পেট ভরেনি !

আমারও ভরেনি !

খা। খা। খা। আমার হাড়মাস চিবিয়ে খা তোরা।

রোগা বড়োমেয়েটা চুপচাপ খায়। এবার সে তার ক্ষীণকণ্ঠে যতদূর পারে চড়িয়ে বলে, তুমি যেন কেমন করো মা। রুটি দিলে না একখানা, আরেক হাতা করে ভাত দাও না আমাদের ? খিদের চোটে রাতে ওরা কাঁদলে ফের মারবে তো ?

ঘরে বসে মেয়েটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পায়। একটু বাঁকা মেরুদণ্ডটা সে সোজা করেছে। শীর্ণ মুখে যেটুকু ক্ষোভের স্ফুরণ হয়েছে, খাঁটি দরদির চোখ ছাড়া নজরেই পড়বে না। ছোটো

ছোটো চোখ, সে চোখে ভর্ৎসনার ঝিলিক দেখে কালো হরিণ চোখের কথা ভুলে গিয়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নতুন প্রতিবাদের কবিতা লিখতেন।

তোমরা সব চেটেপুটে খাবে, আমরা উপোস দেব ? দ্যাখ তো হাঁড়িতে ভাত আছে কতটুকু ? তোদের জন্যে দুবেলা হাঁড়ি ঠেলছি, আমি খাব না ? সারাদিন হাড়ভাঙা খাটছে, সে মানুষটা খাবে না ?

মা-কে কৈফিয়ত দিতে হয় ছেলেমেয়ের কাছে, প্রচার করতে হয় যে মা হওয়া কী মুখের কথা। বাপ হওয়া কী সহজ কাজ ! মায়ের কত ত্যাগ, বাপের কত ত্যাগ, তাতেই মুগ্ধ সন্তুষ্ট থাকা উচিত সন্তানের।

মেজোমেয়েটা ছ্যাঁচোড়। সভ্যতা-ভব্যতা-ভদ্রতা কিছু শেখেনি সাত বছর বয়সে। সে ফ্যাঁস করে ওঠে, ইস ! তোমরা খাবে না-খাবে আমাদের কী ? আরও ভাত রাঁধনি কেন ? তোমরা খাও না যত খুশি, আমরা না করেছি ? আমাদের খালি মারবে, আমাদের খালি পেট ভরে খেতে দেবে না !

হে রাত আটটার তারায়-ভরা আকাশ, একবার বিদীর্ণ হও। কোটি বজ্রের গর্জনে ফেটে চৌচির হয়ে যাও। আমার বাংলার ছেলেমেয়েরা আজ খিদেয় কাতর হয়ে একখানা রুটিব জন্য, একমুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে নিরুপায় মায়ের সঙ্গে !

রাত সাড়ে-দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে যতীন দুদণ্ডের জন্য আমার ঘরে বসে। আড্ডা দিতে নয়—সারাদিন যা করেছে তার একেবারে বিপরীত কাজ আহার এবং নিদ্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে। যে খাটে সে জানে যে খাটুনি শেষ করেই খিদের চোটে দিশেহারা হয়ে খেতে নেই।

তাতে অসুখ হয়। শোষণের স্তর থেকে একেবারে পোষণের স্তরে আছাড় খেয়ে পড়লে সামঞ্জস্য ঠুনকো কাঁচের মতো ভেঙে চৌচির হয়ে যায়।

আমার দেওয়া বিড়িটা ধরায়। টানতে গিয়ে কাশে। গায়ে বাতাস লাগায়। হাঁফ ছাড়ে। দেহ মনের টান করা তন্ত্রী আর স্ক্রুগুলি ঢিল করে দেয়। আমার চোখের সামনে দুদণ্ডে জীবন্ত মানুষটা ঝিমিয়ে নেতিয়ে আসে ! এও বাঁচার লড়ায়ের কৌশল। সকাল থেকে চলেছে সক্রিয় লড়াই—এখনকার লড়াই নিষ্ক্রিয় বিরামের। চিন্তা ভয় ক্ষোভ দুঃখ স্নেহ-মমতা আনন্দ উদ্দীপনা ন্যাকামি কোনো অজুহাতেই আর একবিন্দু বাড়তি শক্তিক্ষয় করা নয়।

খেতে বসেই টের পায় নিজের ভাগ কমিয়ে অমলা তার পাতে ভাত বেশি দিয়েছে। দুটো রসগোল্লা নয়, পেটে খিদে নিয়ে পেট ভরবে না জেনে দুমুঠো ভাত বেশি দেওয়া। এ ত্যাগের আগের দিনের মূল্য দেবার সাধটা মনের কোণে একবার উঁকি দিয়ে যায় বইকী, দরদ দেখিয়ে বলতে ইচ্ছে হয় বইকী যে তুমি আমায় রাক্ষস বানাবে !

কিন্তু সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে নিছক আগের দিনের জের টানার জন্যেই ন্যাকামি করা কি পোষায় মানুষের ?

খেতে শুরু করে খাঁটি দরদ দেখিয়ে বলে, তুমিও বসে যাও ? মিছে রাত করবে কেন ?

হ্যাঁ, আমিও বসি।

ফাঁকা আদর আর মিছে চোখে জল আসার চেয়ে কত মনোরম এই বোঝাপড়া। ভোরে উঠে উনান ধরাতে হবে অবলাকে, রাতের আবছা-আঁধার বজায় থাকা ভোরে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তাকে বিশ্রাম করতে বলাটাই সব চেয়ে সুমিষ্ট আদর।

অবশ্য অবস্থাটা এ রকম বলে।

তারা শোয়। তাদের চোখে গাঢ় ঘুম ঘনিয়ে আসে। ঘুমোতে কেন, শ্বাস উঠে মরতেও দু-চার মিনিট সময় লাগে মানুষের। সেই ফাঁকে মেজোমেয়েটা উঠে চলে যায় রান্নাঘরে।

খিদের আগুনে পুড়ে গিয়েছে তার ঘুম। অন্ধকারে কোথায় গেল, কী করতে গেল মেয়েটা ? অবলাই ওঠে গায়ের জোরে। বলে, মাগো, আর তো পারি নে !

রুটি পায়নি মেজোমেয়েটা। অন্ধকারে আটা নিয়ে সে জলে গুলে খাচ্ছে। খানিক ছড়িয়েছে মেঝেতে।

এঁটো হাতাটা তুলে নিয়ে অবলা প্রাণপণে বসিয়ে দেয় তার পিঠে। আর্তকান্নায় চিরে যায় রাত্রির অন্ধকার।

হট্টগোলে চমকে জেগে কেঁদে উঠেই কান্না থামায় ক্ষীণজীবী রোগা বড়োমেয়েটা।

রান্নাঘরে গিয়ে দ্যাখে কী, বোনটি তার আকাশ-চেরা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে আটার হাঁড়িটা কাত করে ফেলে হাত-পা ছুঁড়ে তছনছ করে উড়িয়ে দিচ্ছে আটাগুলি, বাবা তার দাঁড়িয়ে আছে পুতুলের মতো, মা হাতাটা উঁচু করেছে মেয়েকে আরেক ঘা বসিয়ে দেবার জন্য।

রোগা মেয়েটা দুহাতে হাতাটা চেপে ধরে কেড়ে ছিনিয়ে নেয়। যাকে মাববার জন্য হাতা উঁচু করা, হাতা-ধরা হাত দুটো তারই মায়ের, তাই রোগা কাঠি মেয়েটার ক্ষীণ শক্তিটুকুই হাতাটা কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। সপ্তমে তোলা তীক্ষ্ণ বাঁশির আওয়াজে বলে, পেতলের হাতা দিয়ে মারলে যে মরে যাবে মা ?

ও ! বড়ো যে দরদি আমার।

বলে রোগা মেয়েটার গালে চড় কষিয়ে দেবাব জন্য অবলা হাত তুলেছে, যতীন তার হাতটা চেপে ধরে।

কী করছ ?

অবলা ঠান্ডা হয়ে বলে, আর সয় না, এবার আমি মরব !

মেয়ে বলে, মরবে তো নিজে নিজে মরো না ? আমাদের মারছ কেন ?

মরব না সস্তায়

বলে কিনা, চুলোয় যাক তোমার ঘরসংসার ! আমি এত খেটে খেটে মরতে পারব না।

দুজনেই বলে, যখন-তখন—যে যাকে যখন বলার একটা সুযোগ বা অজুহাত পায়। পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চুলোয় পাঠাবার জন্যই যেন এতকাল ধরে গায়ের রক্ত জল করে তারা দুজনে সংসারটা গড়ে তুলেছে, টিকিয়ে রেখেছে।

রেশন হয়তো না আনলেই নয়।

হৃষিকেশ বলে, সংসার টানার জন্য খাটব গাধার মতো, আবার রেশন আনতে বাজার করতেও ছুটতে হবে আমাকেই ? ছেলেরা যেতে পারে না ? কোথাকার নবাব এসেছে ?

মোহিনী বলে, আমার হয়েছে সবদিকে জ্বালা। দুদিন বাদে ওদের পরীক্ষা নেই ? রাত জেগে জেগে কী চেহারা হয়েছে দেখতে পাওনা ? রেশন আনার কথা বলতে গেলে খেঁকিয়ে উঠবে।

হৃষিকেশ বলে, মেয়ে দুটোকে পাঠাও। বাপের ঘাড়ে গিলবে আর মুটোবে, রেশনটা নিয়ে আসুক।

মোহিনী ঝংকার দিয়ে বলে, হ্যাঁ, ওই ধুমসো দুটো মেয়ে ভিড়ের মধ্যে যাবে রেশনের জন্য ধন্না দিতে ! কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়েছ নাকি তুমি ?

চুলোয় যাক তোমার ঘরসংসার, আমি এত খেটে খেটে মরতে পারব না !

বলে গজরগজর করতে করতে হৃষিকেশ টাকা আর থলি হাতে নিয়ে রেশন আনতে যায়।

স্কুল-কলেজ আপিসের তাড়ায় বিব্রত মোহিনী রান্নাঘর থেকে বড়োমেয়েকে ডেকে বলে, শুভা, চট করে মশলাটা বেটে দে আমায়। একহাতে কত করব ?

শুভা মিনতি জানিয়ে বলে, বাবার কাছে পড়াটা একটু বুঝে নিচ্ছি মা। বাবা তো এখুনি আবার বাজারে চলে যাবে। কলেজে দেবে না, মাস্টার রাখবে না, নিজে নিজে পড়ে কেউ প্রাইভেটে পাস করতে পারে ? কী রেটে ফেল করছে দেখছ তো ?

মোহিনী দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো শিলটা পেতে ধুতে ধুতে ঝংকার দিয়ে বলে, একটা ঠিকে ঝি পর্যন্ত রাখবে না। চুলোয় যাক তোমার ঘরসংসার, এত খেটে খেটে আমি মরতে পারব না।

শুভা উঠে এসে বলে, দাও, বেটে দিচ্ছি। কাজ নেই আমার পরীক্ষা পাস করে।

মোহিনী ধমক দিয়ে বলে, তুই পড়বি যা তো হারামজাদি। কলেজে দেয় না, মাস্টার রাখে না, বই কিনতে কত টাকা লেগেছে হিসাব রাখিস ?

পুলক পড়া ফেলে লাফিয়ে উঠে আসে। মায়ের কাছে হাত দুটি জোড় করে থিয়েটারি ঢংয়ে বলে, ফেল কী আমরা ইচ্ছা করে হই মা ? আমাদের ফেল করাচ্ছে জানো না ? বাংলাদেশের ছেলেরা কী হঠাৎ বোকাহাঁদা হয়ে গেছে ? পরীক্ষা দিয়ে সত্তর-পঁচাত্তর পার্সেন্ট ফেল করে ?

এত বড়ো ছেলের এই অস্বাভাবিক ছেলেমানুষি ঢংটুকুই কী সয় মা মোহিনীর ? ক্ষোভ বিদ্বেষ রাগ আর নালিশ দিয়ে একটা উগ্র প্রতিবাদের মতোই যে নিজেকে খাড়া রাখে সে ছেলের একটু ছ্যাবলামির আঘাতেই যেন ঝিমিয়ে নেতিয়ে যায়, গা এলিয়ে দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ বোজে !

ভাইবোন দুজনেই ভড়কে যায়।

শুভা ঝেঁঝে ওঠে পুলকের উপর,—তোমায় ডেকেছিলাম মুরুব্বিয়ানা করতে ? যাও না নিজের ফেলের পড়া করো না গিয়ে।

এই সরু প্যাসেজটুকু দিয়ে সকলের আনাগোনা। শিল-ধোয়া জলে পায়ে পায়ে আনা ধুলোময়লার কাদার মধ্যে বসে পড়ে মা-কে দুহাতে বুকে জড়িয়ে শুভা বলে, অমন কোরো না মা ! আমরা কী আগের মতো বোকাহাবা স্বার্থপর আছি, তোমার কষ্ট বুঝব না ? কী করি বলো—

চোখ মেলে মেয়ের কোল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একটু বিহ্বলের মতন মোহিনী বলে, মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কী হয়েছিল রে ? কী বলছিস তোরা ?

পরক্ষণে সে যেন খেপে যায়। গলা ফাটিয়ে বলে, তুই যে হারামজাদি কাচা কাপড়টা পরে জলকাদার মধ্যে বসে পড়লি ? কে আবার কাচবে তোব কাপড় ? সাবান সোডা কে জোগাবে ?

বলতে বলতে সে আবার চোখ বুজে সে-ই জলকাদার মধ্যেই গা এলিয়ে দেয়।

ডাক্তার আনতেই হয়। সে-ও আবার পেশাদার ডাক্তার !

অভয় দিয়ে বলে, ক-মাস পারফেক্ট বেস্ট দিতে হবে। আমি একটা ভিটামিন টনিক লিখে দিচ্ছি, সেটা খাবেন। রোজ অন্তত আধসের দুধ চাই। তাব বেশি হজম হবে না তাই বিলাতি কোনো পার্সিয়ালি ডাইজেস্টেড মিল্কফুড—

পুলক বলে, বাবা দুটো টাকা দিয়ে ওঁকে যেতে বলো।

মোহিনীর মাথায় ধার করা আইসব্যাগটা চেপে ধরে রেখে শুভা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। বায়বাবুদের বাড়ির সামনে মোটরটা দাঁড়িয়ে আছে, ভিতরের সিটে বসে সিগারেট টানছে ড্রাইভার করালী। সিগারেট টানতে টানতে দু-একবার উৎসুক চোখ তুলে জানলার দিকে তাকাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে তাকে ভালো দেখতে পাচ্ছে না, আলো বড়ো কম ঢোকে ঘরে, বাতাসের মতোই।

জানালায় গিয়ে যদি সে দাঁড়ায়, করালীব উৎসুক চোখ ক্ষুধাতুর হয়ে উঠবে।

শুধু চোখ। এমনিতে মুখে তার সর্বদাই একটা নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত ভাব। রায়বাবুদের বাড়ির মেয়েদের কাছে শুভা শুনেছে করালীর কেউ নেই, যা রোজগাব করে সব নিজের জন্য খবচ হয়।

আমাদের মতো গন্ধতেল সাবান মাখে, জানিস ? প্রথম ভাবতাম চুরি করে বুঝি। তারপর দেখা গেল, না, বাবু নিজের পয়সাতেই কেনে। ঘরভাড়া লাগে না, খাওয়াখরচ লাগে না...

সিগারেট ফেলে দিয়ে করালী চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। বেলা দশটা বাজে, দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে রায়বাবু এসে গাড়িতে উঠবে,—কিন্তু শুভা জানে, তারই মধ্যে করালী একটু ঘুমিয়ে নিতে পারবে। সে লক্ষ করেছে ফাঁক পেলে যখন ইচ্ছা করালী ঘুমিয়ে নিতে পারে।

ঠিক তাই।

কবালী শুয়ে পড়ার পাঁচ মিনিট পরে রাযবাবু বেরিয়ে আসে, কবালীর ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলতে হয়।

নিজের সিটে বসে গাড়ির স্টার্ট দিয়ে আরেকবার সে উৎসুক চোখে জানালার দিকে তাকায়।

শুভা ভাবে, যদি সম্ভব হত সঙ্গত হত তার সঙ্গে করালীর কথা বলা, তাকে তার মনের কামনা জানানো ! যদি সম্ভব হত, সঙ্গত হত করালীকে তার জানানো যে তার মনের ইচ্ছায় তারও সায় আছে। অনায়াসে করালী কোনো আত্মীয়কে দিয়ে প্রস্তাব পাঠাতে পারত তার বাবার কাছে, তারপর শুভ হোক অশুভ হোক কোনো একলগ্নে বাবার ঘাড় থেকে তার দায় নামত আর তাদের দুজনেরই সাধ আর সমস্যা মিটে যেত।

একার আয় একা ভোগ করার বদলে তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কত খুশি আর কৃতার্থ হত করালী।

রায়বাবুদের পেট-মোটা বিড়ালটা অনেকক্ষণ থেকে ঘরের আনাচে-কানাচে শুঁকে বেড়াচ্ছিল। এ বাড়িতে আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায় কদাচিৎ, দুধ রাখা হয় নামমাত্র, কে জানে বড়োলোকের বাড়ির

পোষা আদুরে বিড়াল এ বাড়িতে এসেছে কেন। মাছ দুধ এঁটোকাঁটার লোভে পরের বাড়ি যাবার কোনোই দরকার তো ওর নেই !

বিড়ালটা লাফ দিয়ে তাকে উঠে সেখান থেকে পুরানো ভাঙা আলমারিটার উপরে উঠে যেতে দেখে শুভা বুঝতে পারে, বাচ্চা পাড়ার জন্য সে নিরাপদ স্থান খুঁজছে।

গতবার ওর বাচ্চাগুলিকে রায়বাবুরা মেরে ফেলেছিল। কিন্তু একটা বিড়াল কী করে টের পেল যে এত ছ্যাঁকা পোড়া খেয়েও তাদের প্রাণটা কোমল রয়ে গেছে, তার বাচ্চাগুলিকে মারবার মতো নিষ্ঠুর তারা হতে পারবে না ?

বাইরে কড়া নড়তে শুভা জিজ্ঞাসা করে, কে ?

বলে, আমি রায়বাবুদের রাঁধুনি। ওদেব বিড়ালটাকে খুঁজছি।

শুভা অবাক হয়ে যায়—রায়বাবুদের নতুন রাঁধুনির এমন চেনা গলা !

উঠে গিয়ে দরজা খুলে সে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

সুরমা বলে, তোমাদের বাড়ি নাকি এটা ?

শুভার গলায় কথা জড়িয়ে যায়, কোনোমতে সে বলে, ভেতরে আসুন দিদিমণি, বিড়ালটা এসেছে।

কতদিন আর হবে, সুরমার কাছে স্কুলে বাংলা পড়ত। সব দিদিমনির চেয়ে তারই বোধ হয় মেজাজ ছিল কড়া আর ধমক ছিল বেশি। সিঁথিতে সবু করে সিঁদুর দিয়ে চওড়া পাড় শাড়ি পবে স্কুলে আসত।

আজ তার পরনে থান, সে রাঁধুনিগিরি করছে রায়বাবুদের বাড়ি।

ভিতরে গিয়ে মাথায় আইসব্যাগ বসানো মোহিনীকে দেখে সুরমা বলে, তোমাব মা বুঝি ? কী অসুখ ?

শুভা বলে, না খেয়ে খাটুনি চিন্তাভাবনা—মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু দিদিমনি আপনি রান্নার কাজ নিলেন কেন ?

এ প্রশ্ন যে উঠবে এবং জবাবও একটা দিতে হবে সে তো জানা কথাই। তবে পাড়ার লোকেব রাঁধুনি হিসাবে বাড়ির দরজায তাকে হাজির হতে দেখে যে বকম থতোমতো খেয়ে গিয়েছিল তাতে এত শিগগির এমন স্পষ্টভাবে সে প্রশ্নটা করে বসবে, সুরমা সেটা ভাবতেও পারেনি।

সে-ই বরং ভাবছিল কীভাবে কথাটা তুলে এককালের ছাত্রীকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

সুরমা ধীরে ধীরে বলে আর বলো কেন, স্কুল থেকে বিদায় কবে দিলে। আরেক জায়গায় কাজ জোটাব তবে তো ? কিন্তু ছেলেপুলে নিয়ে খাই কী ! বসে থাকলে কী আমাদের চলে ? ওদেব রাঁধুনিটা পাড়ায় থাকে, কাজ ছেড়ে দেবে শুনে ভাবলাম আমিই ঢুকে পড়ি। আমার পেটটা তো চলবে, মাস গেলে ক-টা টাকা তো পাব। দুবেলা রাঁধি, দুপুরবেলা কাজের খোঁজে বেরোই।

শুভা বারবার তার পরনের ধুতিটার দিকে তাকাচ্ছে খেয়াল করে সুরমা একটু হাসে।

বলে, না, বিধবা হইনি, উনি বেঁচেই আছেন। বসে খাচ্ছেন বলে বাগ করে বিধবার বেশও ধরিনি। রাঁধুনিটা বললে কী এরা সধবা লোক রাখে না, সধবার নাকি অনেক ঝঞ্ঝাট। বিধবারা অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। তাই বিধবা সাজলাম।

শুভা জিজ্ঞাসা করে, মন খুঁতখুঁত করল না ?

সুরমা অবজ্ঞার সঙ্গে একটু মুখ বাঁকিয়ে যেন মনের খুঁতখুতানি উড়িয়ে দিয়েই বলে, গোড়ায় একটু করেছিল, তারপর ভাবলাম, কী হয় ওতে ? একটু সিঁদুর না দিলে আর শাড়ির বদলে ধুতি পরলেই যদি স্বামীর অকল্যাণ হত—

কথা সে শেষ করে না, আলমারির উপর থেকে বিড়ালটাকে নামিয়ে নিয়ে বলে, না যাই এবার। উনান কামাই যাচ্ছে। একটা বিড়ালের জন্য কী মায়া। অনেকক্ষণ দেখা নেই কোথায় গেল- - এ বাড়ি ও বাড়ি একটু খুঁজে এসো। রাঁধুনিকে ওরা একেবারে মানুষ ভাবে না। আগে ভাবতাম বড়োলোক সেক্রেটারির কাছে টিচাররাই বোধ হয় মানুষ নয়, এখন দেখছি গরিব হলেই মানুষ থাকে না। খানিকক্ষণ বেড়ালের দেখা নেই—অমনি হুকুম, খুঁজে নিয়ে এসো।

কী ঝাঁঝ সুরমার কথায় ! শুভা টের পায় সুরমার গরম মেজাজটা পরিণত হয়েছে ঝাঁঝে। তার মা-র মেজাজের সঙ্গে খানিকটা যেন মিল ছিল বাড়ির ছেলেপুলে আর স্কুলের মেয়েদের ঝঞ্ঝাটে তার কষে যাওয়া মেজাজের।

এক বাড়িতে

বিলাসময়ের স্ত্রী সুরবালা শুনে বলে, না, আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে দেনা-পাওনার সম্পর্ক করতে নেই। বড়ো মুশকিল হয়। বাইরের লোকের সঙ্গে সোজাসুজি কারবার, যা বলবার স্পষ্ট বলতে পারবে। আত্মীয় বন্ধুর কাছে চক্ষুলজ্জায় মুখ ফুটবে না, বন্ধুকে ভাড়াটে করে বাড়িতে এনে কাজ নেই।

বড়ো মুশকিলে পড়েছে বেচারা---

পড়ুক। অমন কত লাখ লাখ লোক ঢের বেশি মুশকিলে পড়েছে। বন্ধুকে অন্য বাড়ি খুঁজে দাও, নিজের বাড়িতে ও ঝঞ্ঝাট ঢুকিয়ে কাজ নেই।

বিলাসময়ও যে কথাটা এদিক থেকে বিবেচনা করেনি তা নয়। সুধীর অনেকদিনের বন্ধু - গলায় গলায় ভাব। সেলামির কোনো প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু ওকে ঘর দুখানা ভাড়া দিয়ে একপয়সা আগাম নেওয়া যাবে না, সময়মতো ভাড়া না দিলে দাবড়ানি দেওয়া যাবে না, উঠতে বসতে সব বিষয়ে বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখে চলতে হবে।

কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেই আবার মুশকিল --রেহাই পাওয়া যায় কীসে ? সুধীর এত করে বলছে, এখন তাকে না দিয়ে অন্য কাউকে ঘর দুখানা কোন অজুহাতে দেওয়া চলবে ?

সে তাই চিন্তিতভাবে বলে, ও কী সহজে ছাড়বে ?

সুরবালা তাকে বুদ্ধি বাতলিয়ে দেয়। বলে, এক কাজ করো। যা দিনকাল পড়েছে, বন্ধু বলেই তো টাকাপয়সার ব্যাপারে খাতির করা চলবে না ? খুব চড়া ভাড়া চেয়ে বসো সঙ্গে কী আশি টাকা। আর আগাম চাও পাঁচশো। বলবে যে একজন আগাম দিয়ে এই ভাড়ায় আসতে চায়। বন্ধু নিজেই ছাড়বে—ভাবতে হবে না !

এ মন্দ যুক্তি নয়। পাঁচশো টাকা আগাম দেবার সাধ্য যদিই বা হয় ধার করে গয়নাগাঁটি বন্ধক দিয়ে—মাসে দুখানা ঘরের জন্য আশি টাকা ভাড়া দেবার ক্ষমতা সুধীরের নেই। চরম চাহিদায় এই বাজারেও ঘর দুখানার চল্লিশ টাকার বেশি ভাড়া হয় না—সাধ্য থাকলেও সুধীর ডবল ভাড়া দিয়ে রাজি হবে কেন ?

ভাগ্যে এখনও ভাড়ার কথা কিছু হয়নি সুধীরের সঙ্গে। সে শুধু দাবি জানিয়ে রেখেছে যে, ঘর দুখানা সে-ই ভাড়া নেবে। অন্য কাউকে যেন দেওয়া না হয়। কীভাবে বন্ধুর কাছে আগাম আর ভাড়ার কথাটা পাড়বে মনে মনে বিলাসময় তাই আওড়াতে থাকে।

পরদিনই সুধীর কথাটা পাকা করতে আসে। দু-তিনমাস তার মুখে দুশ্চিন্তার বাড়তি একটা কালো ছাপ পড়েছিল আজ দেখেই বোঝা যায় মুখ থেকে সে মেঘটা কেটে গেছে।

দেখে, বিলাসময় বড়োই অস্বস্তি বোধ করে।

ঘর দুখানা সে পাবেই এটা নিশ্চিত জেনে বন্ধু একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে ! তা, তাদের বন্ধুত্বের হিসাব ধরলে সুধীরের নিশ্চিন্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। আর নিশ্চিন্ত হয়ে তার মুখে যে অনেকদিন পরে হাসি ফুটবে সেটাও আশ্চর্য নয়। কী অবস্থায় যে তার দিন কাটছে বিলাসময় তা ভালোভাবেই সব কিছু জানে।

কীভাবে এ অবস্থায় এসে পড়েছে সে ইতিহাসও তার অজানা নয়। জন্ম থেকে তার কলকাতায় বসবাস, পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের জন্ম সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামার ধাক্কা লেগেছে তারও গায়ে। তার দাদা ভালো চাকরি করে, একখানা বাড়ি করেছে। অবশ্য স্ত্রীর নামে, নইলে সাহস করে ভাইকে একখানা

ঘরে থাকতে দেবার মতো উদারতাটা দেখিয়ে ফেলার ভুলটা করত কী না সন্দেহ। হঠাৎ পাকিস্তান থেকে উৎখাত হয়ে এসেছে তার শ্বশুরবাড়ির সকলে আর ছেলেপুলে নিয়ে তার বড়ো মেয়ে ও জামাই।

বাড়ি থেকে সুধীরকে সে এক রকম তাড়িয়ে দিয়েছে। সুধীরের মেয়েটির সন্তান সম্ভাবনা সত্ত্বেও। হয়তো নিরুপায় হয়ে অগত্যাই ভাইকে এ অবস্থায় এভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে,—নইলে শেষের দিকে ব্যবহার খারাপ হয়ে এলেও একখানা ঘরে ভাইকে সপরিবারে মাথা গুঁজে থাকতে দিতে আরও কিছুকাল হয়তো তার আপত্তি হত না।

শ্যামবাজারে বোনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল সুধীর -যে ক টা দিন নিজের একটা আস্তানা খুঁজে নিতে না পারে। দুখানা ঘরে বোনের মস্ত সংসার -তার মধ্যে আসন্নপ্রসবা মেয়েটি সমেত সুধীর মাথা গুঁজে আছে আজ প্রায় তিন মাস। তার ওপর স্ত্রীরও তার অসুখ।

বোন, ভগিনীপতি আর ভাগনে-ভাগনির মুখ গোমড়া। ভালো করে কেন কেউ এক রকম তাদের সঙ্গে কথাই কয় না। শুধু গজরগজর করে।

সুধীর প্রথম কথাই বলে মারাত্মক : ঘর দুটো যখন ভাড়াই দেবে—কাল-পরশু থেকে দিয়ে দাও। আজ মাসের তেইশে মিছে আর পয়লা পর্যন্ত ভোগাবে কেন ! একেবারে পাগল হয়ে যেতে বসেছি।

বিলাসময় চেষ্টা করেও মুখের ভাব বা গলার স্বর স্বাভাবিক রাখতে পারে না। রীতিমতো গম্ভীর হয়ে বলে, তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার আমার মধ্যে ঢাকঢাক গুড়গুড় কিছু নেই—আমাদের সে সম্পর্ক নয়।

সুধীর ভড়কে গিয়ে বলে, এ যে বিষম রকম ভূমিকা করে বসলে ! ব্যাপার কী ভাই ?

ব্যাপার কিছু নয়। তোমায় শুধু খোলাখুলি একটা কথা বলছি। ভাড়া-টাড়ার ব্যাপারে আমি কিন্তু কোনো রকম কনসেশন দিতে পারব না। অন্যের কাছে যা পাব তোমাকেও তাই দিতে হবে।

সুধীর স্বস্তি পেয়ে বলে, তাই বলো ! এই কথা ? অন্যে যা দেবে আমিও নিশ্চয় তাই দেব। আমি চেয়েছি কনসেশন ? আমিও ভাবছিলাম তোমায় স্পষ্ট বলে দেব, এ সব বিষয়ে যেন কোনো রকম সংকোচ কোরো না। লেনদেনের ব্যাপারে বন্ধুত্ব টানতে নেই—সাফ স্পষ্টকথা। ঘর পাচ্ছি তাই ঢের, তোমার আর্থিক ক্ষতি করব কেন ভাই।

বিলাসময় স্ত্রীকে স্মরণ করে আন্তরিক নিশ্বাস ফেলে বলে, দিনকাল বুঝতেই পারছ। তাছাড়া এ শুধু আমার নিজের ব্যাপার নয়—উনিও একজন কর্তাব্যক্তি।

সুধীর হেসে বলে, আমাকে কর্তা চেনাচ্ছ নাকি ? আমার বাড়িতে কর্তাব্যক্তি নেই ?

সে তখনও ধারণা করতে পারেনি বিলাসময় দুখানা ঘরের জন্যে কী অসম্ভব দাবি করে বসবে। বন্ধুর প্রস্তাব শুনে হাসি মিলিয়ে তার মুখ খানিকটা হাঁ হয়ে যায়। বিস্ময় আর অবিশ্বাস তাকে বলায় : ঠাট্টা করছ ?

না ভাই, ঠাট্টা নয়। এর কমে পারব না। কালকেই এক- ন আমায় টাকাটা হাতে গুঁজে দিয়ে রসিদপত্র লিখে ফেলবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল।

পাঁচশো টাকা আগাম ? আশি টাকা ভাড়া

সুধীরের বিস্ময় আর অবিশ্বাস যেন কিছুতেই কাটতে চায় না।

বিলাসময় তার মুখের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে চেয়ে বলে, তুমি হয়তো ভাবছ, আমিও দলে ভিড়েছি, চামার হয়ে পড়েছি। কিন্তু কী করি বলো ? অন্যের কাছে যা পাব, তোমার বেলা কমাতে পারব না। টাকার চিন্তায় পাগল হতে বসেছি। তোমার পোষাবে না জানি, আমি বরং তোমায় কম ভাড়ার ঘর খুঁজে দেব।

সুধীরের মুখে অদ্ভুত এক ধরনের একটু হাসি ফোটে।

তিন মাসে খুঁজে দিতে পারলে না, আর কবে খুঁজে দেবে ?

বিলাসময় কথা কয় না।

সুধীর একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনের ভাবের প্রতিফলনে তার মুখে যেন ঘন কালো মেঘ আর চড়া রোদের খেলা চলতে থাকে। সকলের জীবনে চারিদিক থেকে কী ভয়ংকর কী বীভৎস সব অন্যায় আর অনিয়মের আবির্ভাব ঘটেছে। দিন দিন যেন ভয়াবহ হয়ে ওঠার রেটটা চড়ছে জীবনযাপনের। যুদ্ধ থেমে গিয়ে ইংরাজ চলে গিয়ে কংগ্রেস রাজা হয়েছে বলে কী এত স্বপ্নাতীত অঘটন অনিয়মও সম্ভব হতে পারে ?

সুধীর বলে, ঘর খুঁজে দেবে বলছ, কিন্তু এই যদি ঘরভাড়ার বাজারদর হয়, কম ভাড়ায় ঘর তুমিই বা কোথায় খুঁজে পাবে ?

দেখব চেষ্টা করে।

দু-চার-দশবছর লেগে যাবে।

বিলাসময় আবার চুপ করে থাকে।

সুধীর বলে যাক গে, কী আর করা যাবে। এর মধ্যে খবর পেয়ে একজন যখন পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে ওই ভাড়ার ঘর দুটো ভাড়া নিতে পীড়াপীড়ি করছে, ঘরভাড়ার বাজারদরটা এই রকম দাঁড়িয়েছে নিশ্চয়।

বিলাসময় বেশ খানিকটা শঙ্কিত হয়ে বন্ধুর কথা শোনে। সুধীর সত্য তার অসম্ভব দাবি মেনে নেবে নাকি !

সুধীর আরও মিনিটখানেক ভেবে বলে, বেশ, আমি রাজি। তুমি যা চাইছ তাই দেব।

পারবে ?

পারব—কষ্ট হবে। দিনকালটাই দুঃখকষ্টের—উপায় কী ! আমি কিন্তু পরশুই আসব ভাই। এ ক-দিনের জন্য অর্ধেক মাসের ভাড়া দেব কিন্তু। পুরো মাসের দেব না আগেই বলে রাখছি।

সুরবালা আড়াল থেকে কান পেতে সব কথাই শুনছিল। খানিক পরে সে চা আর শিঙাড়া নিয়ে ঘরে ঢোকে।

এসে বাইরের ঘরেই বসে রইলেন ? অন্তত একটা খবর তো দিতে হয় !

খবর পেয়েছেন সে তো দেখতেই পাচ্ছি—খাবার এসে গেছে। দুদিন বাদে স্থায়ীভাবে ভেতরে ঢুকছি, সবাইকে নিয়ে। জ্বালাতনের একশেষ হবেন।

জ্বালাতন হতেই তো চাই !

বিলাসময় মুখের দিকে চেয়ে—সুরবালা যেন আড়াল থেকে কিছুই শোনেনি কিছুই জানে না এইভাবে বলে, কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল ?

হ্যাঁ। ও রাজি হয়েছে। পরশু দিন আসবে বলছে।

সুরবালা বলে, বেশ তো ভালোই। কাল সন্ধ্যায় তাহলে লেখাপড়াটা করে ফেলুন ? না পরশু সকালে আসবেন ?

সুধীর শিঙাড়া চিবোতে চিবোতে বলে, কাল সন্ধ্যাবেলাই আসব। পরশু আসব সবাইকে নিয়ে।

সুধীর আর বড়োছেলে বিষ্ণুর গায়ের জোরের উপর নির্ভর করে গাড়ি থেকে নেমে টলতে টলতে বাড়ির ভিতরে যাওয়ার সময় অলকাকে দেখেই টের পাওয়া যায় গত সন্ধ্যায় সুধীর কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করে এনে পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে ঘরভাড়ার চুক্তিপত্র সই করেছিল। অলকার গা খালি। সুরবালার ঠিকা ঝির নাকে কানে আর হাতে যেটুকু সোনা আছে, অলকার গায়ে সেটুকুও নেই। সোনা-বাঁধানো একটি লোহা পর্যন্ত নয়। শুধু কপালে সিঁদুর আর হাতে শাঁখা।

পাঁচশো টাকা আগাম দিয়ে আশি টাকা মাসিক ভাড়ায় যে মানুষটা ঘরভাড়া করে তার বউ যখন স্বর্ণচিহ্নলেশহীনা হয়ে ভাড়াকরা ঘরে ঢোকে তখন কী আর অনুমান করতে কষ্ট হয় যে মেয়ের বিয়ে দিয়ে গয়নাগাঁটি যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়ে ঘরভাড়া আগামের টাকাটা সংগ্রহ করা হয়েছে।

পুষ্প নিজেই গাড়ি থেকে নামে খুব সাবধানে। আজকেই কোনো একসময় তার প্রসববেদনা শুরু হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সুরবালার মেয়ে বিনতা পুষ্পর সমবয়সি বিয়ের আগে দুজনের গলায় গলায় ভাব ছিল। বিয়ের পর দুজনের দেখা হয়েছে কদাচিৎ—বছরে দু-একবার।

তবু কুমারী জীবনের সখিত্ব কী শেষ হয় বিয়ের পর কয়েক বছরের অদর্শনে ? বিনতার ছেলেপিলে হয়নি এখনও, সে শুধু বেড়াতে এসেছে বাপের বাড়ি,—উৎসুক আগ্রহে সে এগিয়ে যায়, পুষ্পকে বলে, ‘‘বেশ, বিয়ে তো সবারই হয়, এর মধ্যে এমন কাণ্ড করেছিস ?

পুষ্প ভারী মুখে নিস্পৃহভাবে সংক্ষেপে বলে, কাণ্ড আবার কী ? তুই নিশ্চয় ঠেকিয়েছিস ?

হায়, সখিত্ব শেষ হয়ে গেছে তাদের। কোনো স্বার্থের কোনো টানাটানি থাকে না বলে যে ছেলেমানুষি সখিত্ব জমায়েত থাকে আজীবন—একযুগ পরে ঘটনাচক্রে কয়েক ঘণ্টার জন্যে দেখা হলে দুটি ধর্ষিতা নিপীড়িতা মনেও আবার ছেলেমানুষি বৃপকরসের আমেজ লাগে—সেই সখিত্ব তাদের তিতো হয়ে গেছে।

কেন হয়েছে সে তো জানা কথাই।

প্রথম কাজ বিছানা পেতে অলকাকে শুইয়ে দেওয়া, তারপর ঘরসংসার গুছানো। সুরবালা অলকার কাছে গিয়ে দাড়ায়।

রোজ জ্বর আসে নাকি ?

রোজ।

অলকা খুকখুক করে কাশে। শঙ্কিত চিন্তিত দৃষ্টিতে সুরবালা চেয়ে থাকে। কে জানে এ কী রোগ বাড়িতে ঢোকানো হল ? বেশি মেলামেশা ঘেঁষাঘেঁষি চলবে না।

ছেলেমেয়েদের সুরবালা সাবধান করে দেয়।

এক বাড়িতে সপরিবারে দুটি বন্ধু—বাড়িওলা ও ভাড়াটে সম্পর্ক। ক-দিন আগেও রাস্তায় দেখা হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে কখন ঘণ্টা কাবার হয়ে গেছে টের পাওয়া যায়নি, আজ এত কাছাকাছি এসেও দু-চারমিনিটের বেশি আলাপ হয় না—তাও আবার ছাড়াছাড়া ভাসাভাসা আলাপ ! সময় আছে ঢের—হঠাৎ যেন বক্তব্য ফুরিয়ে গেছে উভয় পক্ষের ! দূরে দূরে দুটি ভিন্ন বাড়িতে থাকার সময় যেমন নিজের নিজের ভাবনা নিয়ে তারা মশগুল থাকত, সেই দূরত্বই যেন এসেছে এক বাড়িতে পার্টিশনের দু-পাশের মধ্যে !

পার্টিশন শুধু ঘর দুখানার জন্য। সদর দরজা এক, কল বাথরুম এক, বারান্দার একটু অংশ ঘিরে তৈরি নতুন রান্নাঘর ও সুরবালার রান্নাঘরে যাওয়া-আসা একই বারান্দা দিয়ে।

দূরত্বটা তাই স্পষ্ট অনুভব করা যায়—প্রত্যেকে অনুভব করে : কাছে আসার বাস্তবতাটা বাতিল করার কৃত্রিম বিশ্রী দূরত্ব।

মাসকাবারে সুধীর অর্ধেক মাসের ভাড়া দিতে গেলে বিলাসময় বলে, থাকগে, এ ক-টা দিনের ভাড়া দিতে হবে না। একেবারে সামনের মাস থেকে দিয়ো।

তা কী হয় ! কথা যা হয়েছে সেটা শুনতে হবে বইকী !

মাসের মাঝামাঝি পুষ্প তিন দিন দারুণ কষ্ট পেয়ে একটি ছেলে বিয়োয়. বাচ্চাটা মারা যায় পরদিন। বাচ্চাটা মারা যাওয়ায় কেউ বিশেষ দুঃখিত হয়েছে মনে হয় না, বরং আরও একটা দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য একটু স্বস্তিই যেন সকলে বোধ করে—পুষ্প পর্যন্ত।

ছেলেপিলে হয়ে মারা গেলে শুধু চুকেবুকে যায় হাঙ্গামা. মায়েব পর্যন্ত আপশোশ হয না, অবস্থার ফের এমনও করে দিতে পারে এই সব স্নেহাতুরাদের ? পেটের দায়ে ছেলেমেয়ে বেচে দেবার কাহিনি আজও এই দুর্ভিক্ষের দেশে শোনা যায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বাপ-মা ব তো এই হিসাবটাও থাকে যে অন্যের হয়ে যাক, ছেলেমেয়ে তো উপোস দিয়ে মরার বদলে বাঁচবে।

কোনো হাসপাতালে বেড খালি পাওয়া যায়নি। অন্য প্রসবাগারে দেওয়া যেত—কিন্তু বেডের ভাড়া আর আনুষঙ্গিক খরচ বড়ো বেশি। বাড়িতে ভালো ডাক্তার আনা যেত ; কিন্তু ভালো ডাক্তারের ভাড়া বডো চড়া। সাধারণ যে ডাক্তার সুধীর এনেছিল সে-ও পুষ্পব কষ্টভোগ কমাতে পাবত, বাচ্চাটাকে হয়তো বাঁচাতে পারত কিন্তু...এখানেও সেই এক কিন্তু—সে জন্য যে চিকিৎসা দবকার ছিল তার জন্য খরচ দরকার ছিল অত্যধিক।

জামাইকে টাকা পাঠাতে জরুরি তার করেছিল। ছাঁটাই-বেকার জামাই এসেছিল খালি হাতে—সব চুকেবুকে যাওয়ার পর জামাইকে তার ফিরে যাবার গাড়িভাড়া দিতে হয়েছে।

সকলেই প্রায় নির্বিকারভাবে হিসাব-কষা স্বস্তির সঙ্গে বাচ্চাটার মবণকে স্বীকার করেছে, সুধীব পারেনি। এই তার প্রথম নাতি বলে নয়, ও সব শখ আর সুখের হিসাব তার চুকে গেছে। সে ছাড়া বাড়ির কেউ জানে না যে চেষ্টা করলে—টাকা খরচ করলে-—বাচ্চাটাকে বাঁচানো যেত। সেই শুধু জানে। সেই শুধু জানে যে, মেয়েটার তিনটি দিনরাত্রি ঘরে অমন বীভৎস যন্ত্রণাভোগও প্রয়োজন ছিল না।

মেয়েটার জন্যই এক রকম মরিয়া হয়ে দুটি ঘরের জন্য সে পাঁচশো টাকা জোগাড় করেছে, দেড়শো-দুশো টাকার জন্যে সেই মেয়েটাকে ঠিকমতো প্রসব করানো গেল না।

সুধীরের বুকটা তাই জ্বলে যায়—আপশোশে ক্রোধে ক্ষোভে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় !

তবু শান্ত নির্বিকারভাবেই সে মাসকাবারে দুশো টাকা বেতন থেকে আশি টাকা বিলাসময়ের হাতে গুনে দেয়, স্ট্যাম্প আঁটা রসিদ গ্রহণ করে।

তারপর একদিন হঠাৎ স্তম্ভিত বিস্ময়ের সঙ্গে বিলাসময় ও সুরবালা টের পায় সুধীর তাদের কিছু না জানিয়েই ঘর দুখানার ন্যায্য ভাড়া ঠিক করে দেবার জন্যে রেন্ট-কনট্রোলারের কাছে দরখাস্ত করেছে।

ভাড়া নির্দিষ্ট হয় চল্লিশ টাকা। যে আশি টাকা সুধীর দিয়েছে তার অর্ধেক টাকা পরবর্তী মাসের অগ্রিম ভাড়া হিসেবে ধরা হয়।

সব চুকেবুকে যাবার পর সদর দরজায় খিল লাগিয়ে ভেতরে এসে বিলাসময় আকাশে গলা তুলে চিৎকার করে বলে এত বড়ো বজ্জাত তুমি ! বন্ধু সেজে বন্ধুর সঙ্গে এই ব্যবহার ! এই মতলব ঠিক করে তুমি ঘরভাড়া নিয়েছিলে ? বেরোও তুমি আমার বাড়ি থেকে তোমার আগাম টাকা, ভাড়ার টাকা পাই পয়সাটি পর্যন্ত ফিরিয়ে দিচ্ছি, বেরিয়ে গিয়ে রেহাই দাও আমায় !

সুরবালা তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচায় : বন্ধুর বেশে এ কোন সর্বনেশে শনি ঘরে ঢুকেছে গো !

ঘর দুখানা থেকে কোনো জবাব আসে না। শুধু শোনা যায় সুধীর বিষ্ণুকে ধমকাচ্ছে চুপ করে থাক। কথাটি বলবি না।

বিলাসময় ধৈর্য হারিয়ে গাল দিয়ে বলে, হারামজাদা, জুয়াচোর বজ্জাত ! বেরো তুই আমার বাড়ি থেকে। তোদের আমি ঘাড়ে ধরে লাথি মেরে বাড়ি থেকে তাড়াব।

বিষ্ণু কলেজে পড়ে। তার আহত তীব্রকণ্ঠ শোনা যায় চুপচাপ গালাগালি শুনবে বাবা ?

জবাবে সুধীরের দৃঢ়কণ্ঠ শোনা যায় দিক না গালাগালি। ছোটোলোক মানুষ আর কুকুর ঘেউ ঘেউ করে। আমাদের কী বয়ে গেল ? পুলিশ ডেকেও তো আমাদের তুলতে পারবে না। তুই চুপ করে বসে থাক।

চুপচাপ গাল শুনব !

বিষ্ণুর কথা প্রায় আর্তনাদের মতো শোনায়।

বিলাসময় গর্জন করে বলে, এই শূয়ার বেরোলি ঘর থেকে ?

তীরবেগে বিষ্ণু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বিলাসময়ের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, শূয়ার বলছেন কাকে ?

সুরবালা আতঙ্কে উঠে স্বামীর গায়ের গেঞ্জি টেনে ধরে বলে, থাক থাক, চুপ করো। পরে বিহিত হবে।

বিলাসময় বিষ্ণুর গালে একটা চাপড় বসিয়ে দেয়। বলে, শূয়ার বলছি তোর বজ্জাত জুয়াচোর বাপকে।

সেটা উভয়পক্ষের কমন বারান্দা। বারান্দার এ প্রান্তে সুধীরদের জন্য সংক্ষেপে ঘেরা রান্নাঘর পুষ্প সেখানে চালকুমড়ার তরকারি রেঁধে কুচি করে কাটা ঢোকলা দিয়ে ছেঁচকি বাঁধতে বাঁধতে খুন্তি হাতে বেরিয়ে এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিষ্ণু তার হাতের সেই সস্তা চিলতে খুন্তিটা কেড়ে নিয়ে বিলাসময়ের ঘাড়ে খাঁড়ার মতো কোপ মারে। খুন্তির ঘায়ে মানুষের গায়ের চামড়ার চলটা পর্যন্ত তোলা যায় না দেখে সে বোধ হয় খেপে যায়।

বারান্দার এদিকে শেষ প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে বিলাসময়ের কয়লা রাখা হয়। এক একখানি আস্ত ইট দিয়ে ঘেরোয়া কয়লা গুদামটির সীমা প্রাচীর করা হয়েছে। বিষ্ণু অবশ্য অনায়াসে ওই আলগা ইঁট তুলে নিয়ে বিলাসময়কে মারতে পারত।

তার বদলে সে কয়লারই একটা সাত আটসেরি চাপড়া তুলে নিয়ে বিলাসময়ের মাথায় প্রাণপণে ঠুকে দেয়। আগের দিন বিকেলে বিলাসময়ের দুমন কয়লা এসেছিল। দুমন কয়লায় তার তেরো দিন চলে। বিলাসময় কাত হয়ে পড়ে যায়। মনে হয় সে যেন সুরবালার কোলেই ঢলে পড়েছে।

তার ফাটা মাথা দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসে।

১৮৯-বি গোপাললাল ঠাকুর রোড
আলমবাজার
কলিকাতা - ৩৫

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

কিছুদিন আগে একজন বন্ধু আমাকে [illegible] 'হাঁসিতে হাসতে ফেরি' [illegible] পাঠ করে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি এই মৃত্যুকে স্বাভাবিক মনে করেন না? আদর্শের জন্য প্রাণ দেওয়া কি ভুল আদর্শ? কোনোভাবে বেঁচে থাকাই কি সব?

প্রশ্ন শুনে সত্যই ভড়কে গিয়েছিলাম। অনেক ভেবে দেখেও কিছু সান্ত্বনা পাইনি যে আমার কোনো লেখা বা বক্তৃতার [illegible] মধ্যে এ প্রশ্ন জাগিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মৃত্যু ও মৃত্যুভয় [illegible] আমার চোখে 'উচিত' জীবনে মৃত্যু ও মৃত্যুভয় [illegible] সহজ হয়। আমার সাম্প্রতিক লেখা সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা শুনছি, এ প্রশ্নও এই আলোচনার [illegible] পড়ে।

তাই ভাবছিলাম, সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত আমার গল্প 'মরতে পারবে না' পড়ে কি কারো মনে হওয়া সম্ভব যে [illegible] জন্য, শুধু আদর্শের জন্য জীবন খুইয়ে দেওয়াকে [illegible] প্রচার করছি? কোনোভাবে বেঁচে থাকাই তো কাম্য সব কিছুর চেয়ে? সাম্প্রতিক কালের আগে 'সমুদ্র গর্জন' বা 'ভাবের ফাঁদে ফাঁকির ফাঁদ' বা এই জাতীয় আমার দু'একটি গল্প পড়ে কি কেউ ভুল করেছেন?

লেখকের মনে যাই থাক, তার লেখা দিয়েই লোকে তার [illegible] বিচার করবে। একথাও ঠিক যে অন্যরকম লিখে কোনো অজুহাতেই [illegible] নয়, মনে করে লেখককে ভুল স্বীকার করতে হবে। প্রগতিবাদী লেখক হবার দাবী নিয়ে, ভুল করে বা অজান্তে প্রগতি-বিরোধী বিভ্রান্তিকর কোনো প্রচার করতে পারি কি।

ফেরিওলা প্রসঙ্গে লেখকের একটি চিঠির অংশ